হিন্দুধর্ম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী

প্রফেসর ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রফেসর ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক

বিষ্ণু দাশ

ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার

ড. শিশির মল্লিক

শিখা দাস

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর আলোকে প্রণীত মাধ্যমিক স্তরের সপ্তম শ্রেণির **হিন্দুধর্ম শিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটিতে হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক বিষয় ও বিধানসমূহ এবং এ ধর্মের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া হিন্দুধর্মের বিধানসমূহ, হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিভিন্ন জীবনাদর্শ, উপাখ্যান, অবতার, মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবনচরিত ও বাণী সম্পর্কে এ বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এ সকল বিষয় শিক্ষার্থীদের নৈতিক গুণাবলি যেমন– সততা, উদারতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সৎ সাহস, সংযম, সহনশীলতা, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ঈশ্বরের স্বরূপ	১–৮
দ্বিতীয়	ধর্মগ্রন্থ	৯–১৭
তৃতীয়	হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস	১৮–২৬
চতুর্থ	নিত্যকর্ম ও যোগাসন	২৭–৩৩
পঞ্চম	দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ	৩৪–৪০
ষষ্ঠ	ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা	৪১–৪৯
সপ্তম	আদর্শ জীবনচরিত	৫০–৬৮
অষ্টম	হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ	৬৯–৭৯

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরের স্বরূপ

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণী ও বস্তুর একজন স্রষ্টা রয়েছেন। যাঁকে আমরা সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর বলি। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার, তবে তিনি সাকার রূপও ধারণ করতে পারেন। যেমন– অবতার, দেব-দেবী প্রভৃতি তাঁর সাকার রূপ। এ অধ্যায়ে স্রষ্টা এবং ঈশ্বর শব্দের অর্থ, ঈশ্বরের স্বরূপ এবং ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- স্রষ্টা এবং ঈশ্বর শব্দ দুটির অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বরের নিরাকার ও সাকার সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বরের সাকার রূপের বর্ণনা করতে পারব
- ঈশ্বরের একত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি সহজ সংস্কৃত শ্লোক সরলার্থসহ বলতে পারব এবং ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বরের বিভিন্ন সাকার রূপের মধ্যে ঈশ্বরের একত্ব উপলব্ধি করে তাঁর উপাসনায় উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১ : স্রষ্টা ও ঈশ্বর শব্দের অর্থ

স্রষ্টা মানে যিনি সৃষ্টি করেন। যেমন মৃৎশিল্পী মাটি দিয়ে হাঁড়ি-পাতিল, খেলনা, প্রতিমা ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। কিন্তু তিনি মাটি সৃষ্টি করতে পারেন না। শুধু মাটিই নয়, আমরা জল, নদী-সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জীব-জন্তু ইত্যাদি সৃষ্টি করতে পারি না। যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। এ সকল সৃষ্টির পিছনে এক অসীম শক্তি বিরাজ করছে। এ অসীম শক্তির বলেই সবকিছু একটি নিয়মের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হচ্ছে। যিনি এই মহাশক্তিধর তাঁকে স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। এ স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তাকে আমরা ঈশ্বর বলি।

ঈশ্বর শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রভু। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি শৃঙ্খলার সঙ্গে জীব-জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। সকল শক্তি ও গুণের তিনিই আধার। সূর্যের আলো তাঁরই আলো। তিনিই জীবের মধ্যে আত্মা রূপে অবস্থান করেন। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনের একমাত্র কর্তা। তিনিই মৃত্যুর সীমায় জীবনকে বেঁধে দিয়েছেন। এভাবেই তিনি জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন। এ জন্যই তাঁর নাম ঈশ্বর। তাঁর আদি নেই, তাই তিনি অনাদি। তাঁর অন্ত নেই, তাই তিনি অনন্ত। তাঁর বিনাশ নেই, তাই তিনি অবিনশ্বর।

হিন্দু ধর্মানুসারে আমরা স্রষ্টাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করি। যেমন –ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান, পরমাত্মা ইত্যাদি । এ পৃথিবীতে আরো অনেক ধর্মমত আছে। যেমন – ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, শিখ ইত্যাদি। বিভিন্ন ধর্মে স্রষ্টাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন–আল্লাহ্, খোদা, গড ইত্যাদি। এক স্রষ্টারই বিভিন্ন নাম। ঈশ্বর স্রষ্টার একটি নাম।

একক কাজ : স্রষ্টা ও ঈশ্বরের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর ।

পাঠ ২ ও ৩ : ঈশ্বরের স্বরূপ - নিরাকার ও সাকার

পৃথিবীতে এমন অনেক বস্তু রয়েছে, যাদের আকার আছে। যেমন– ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল জীব– মানুষ, জীবজন্তু ও গাছপালা। আবার অনেক কিছু আছে, যেগুলোর আকার নেই। যেমন বায়ু , আলো, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি।

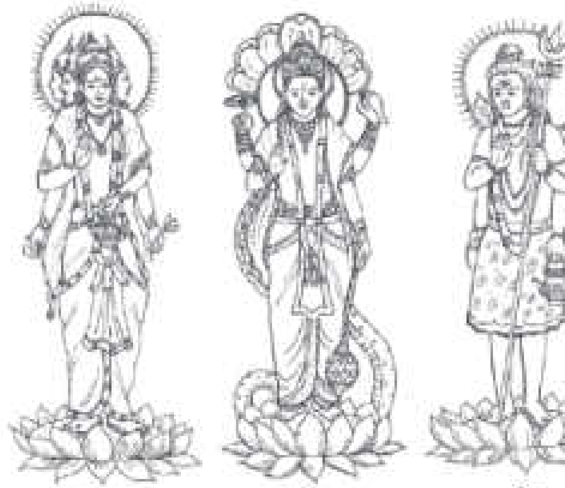

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব

ঈশ্বরের কোনো আকার নেই । ঈশ্বর নিরাকার । তাঁকে দেখা যায় না। কিন্তু আমরা তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করি।

তবে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি নিজ অসীম ও অনন্য শক্তির বলে যে কোনো আকার ধারণ করতে পারেন। ঈশ্বরের সাকার রূপ নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

এক. ঈশ্বর নিজেকে বা নিজের অংশবিশেষকে সাকার রূপ দান করেন। এ রূপগুলো হলো অবতার ও দেব-দেবী।

দুই. ঈশ্বর নিজেই জীবের মধ্যে যখন আত্মা রূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁকে জীবাত্মা বলা হয়।

অবতার

যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় অর্থাৎ অন্যায় অবিচারে বিপর্যস্ত হয় মানবজীবন এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে তখন ঈশ্বর কোনো না কোনো রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। অবতরণ শব্দটির অর্থ নেমে আসা । ঈশ্বর বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে অবতরণ করেন বলে তাকে অবতার বলা হয়। যেমন– ঈশ্বর ত্রেতাযুগে রামরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রাম অবতারে তিনি রাবণসহ দুর্বৃত্তদের দমন করে ধর্ম বা ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দ্বাপর যুগে ঈশ্বর বা ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে নেমে এসেছিলেন। অন্যান্য অবতার ঈশ্বরের অংশ। আর শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার। তাই বলা হয়েছে– 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'– শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

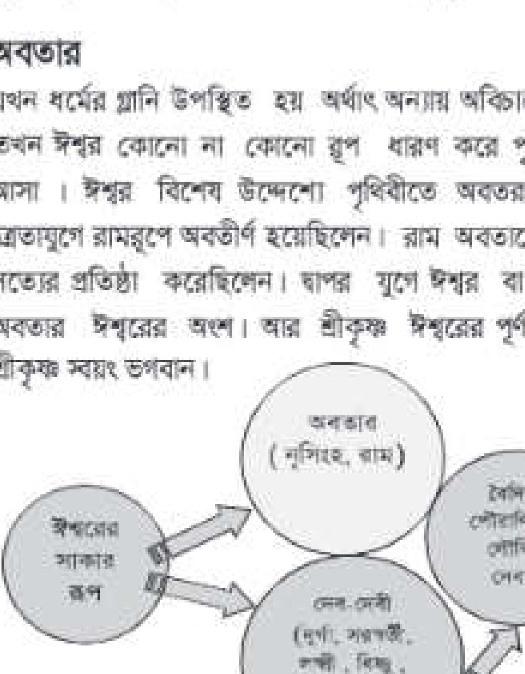

দেব-দেবী

ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি যখন রূপ বা আকার ধারণ করে সাকার হয়ে ওঠে এবং বিশেষ গুণ, শক্তি বা মহিমা প্রকাশ করে তখন তাঁকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। অর্থাৎ দেব-দেবীরা ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা শক্তির সাকার রূপ । যেমন– ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণু রূপে ঈশ্বর জীবজগৎকে রক্ষা ও প্রতিপালন করেন, শিব রূপে তিনি ধ্বংস করে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করেন।

অপরদিকে দুর্গা শক্তির দেবী, সরস্বতী বিদ্যার দেবী, লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী ইত্যাদি। যেহেতু দেব-দেবীরা ঈশ্বরের অংশ, তাই দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

জীবাত্মা

ঈশ্বর যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁকে জীবাত্মা বলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন,

'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।'

অর্থাৎ দেহের সীমায় জীবাত্মারূপে পরমাত্মা বা ঈশ্বর বিদ্যমান থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন যে,

ঈশ্বর বহুরূপে আমাদের সম্মুখেই আছেন। এ বহুরূপ বলতে জীবকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর নিরাকার; কিন্তু তিনি সাকার রূপ ধারণ করতে পারেন। তাঁর সাকার রূপগুলো হচ্ছে– অবতার, দেব-দেবী ও জীব। কিন্তু ঈশ্বরের এসকল সাকার রূপ আলাদা কিছু নয়। সব সাকার রূপ একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।

একক কাজ : ঈশ্বরের সাকার রূপের দুইটি গুণ চিহ্নিত কর।

পাঠ ৪ ও ৫ : ঈশ্বরের একত্ব

পূর্ববর্তী পাঠসমূহ থেকে আমরা জেনেছি, ঈশ্বরের স্বরূপ নানাভাবে প্রকাশিত। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার। তাঁকে বিভিন্ন ধর্মমতের অনুসারীরা নানা নামে অভিহিত করেন। আমরা তাঁর নিরাকার স্বরূপকে ব্রহ্ম বলে থাকি। তিনি কৃপাময় দয়াময় বলে তাঁকে ভগবান বলা হয়। আবার ঈশ্বর দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করেন এবং সত্য ও ন্যায়-

নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো-না-কোনো রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তাঁর সেই বিশেষ বিশেষ রূপকে অবতার বলা হয়।

যেমন– শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, মৎস্য অবতার প্রভৃতি।

অন্যদিকে, ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি যখন আকার পায় তখন তাঁকে দেবতা বা দেবদেবী বলে। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব – ঈশ্বরের তিনটি প্রধান কর্মের জন্য তিনটি প্রধান রূপ । ব্রহ্মা রূপে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু রূপে পালন করেন এবং শিব রূপে জীব ও জাগতিক বস্তু ধ্বংস করে ভারসাম্য রক্ষা করেন। দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তিরূপ । সরস্বতী দেবী রূপে ঈশ্বর আমাদের বিদ্যা দান করেন।

ভক্তেরা দেব-দেবীর পূজা করেন। তাঁদের স্তবস্তুতি করে তাঁদের কাছে বিশেষ বিশেষ প্রার্থনা জানান।

এর মধ্য দিয়ে প্রশ্ন জাগে : তাহলে কি ঈশ্বর বহু ? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে : না। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার। আবার তিনিই সাকার। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (১।৬৪।৪৬) এক ব্রহ্মকেই বিপ্রগণ বহু নামে অভিহিত করেছেন। কিংবা 'একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি' (১।১১৪।৫) এক ঈশ্বরকেই সাধু-সন্তেরা বহু নামে ডাকেন এবং উপাসনা করেন। যেভাবেই উপাসনা করা হোক-না কেন, সবই ঈশ্বরের উপাসনা। সবই তাঁর কাছে পৌঁছায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে –

১. যারা অন্য দেবতায় ভক্তিমান হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের পূজা করে, তারা ঈশ্বরেরই পূজা করে। (৯/২৩)
২. ঈশ্বরই সকল যজ্ঞ বা পূজার গ্রাপক ও ফলদাতা। (৯/২৪)
৩. যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেভাবেই সন্তুষ্ট করি। মানুষেরা বিভিন্নভাবে মূলত আমার পথকেই অনুসরণ করে। (৪/১১)

সুতরাং কেবল হিন্দুধর্মাবলম্বীরা নয়, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ মত ও পথ অনুসারে একই ঈশ্বরের উপাসনা করে। এই হলো ঈশ্বরের একত্ব। ঈশ্বর নিরাকার হলেও, তাঁরই ইচ্ছায় সাকার রূপে তাঁর বিচিত্র প্রকাশ।

একক কাজ: ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে পাঁচটি যুক্তি দাও।

পাঠ ৬ : ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥১১/৩৯

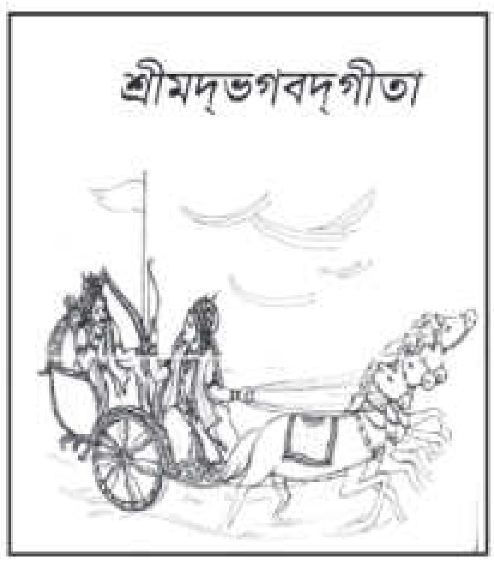

সরলার্থ : তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ ও চন্দ্র। তুমিই ব্রহ্মা, আবার ব্রহ্মারও স্রষ্টা তুমি। তোমাকে নমস্কার করি হাজারবার, বারবার তোমাকে নমস্কার।

ব্যাখ্যা : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপ দর্শন যোগ নামক একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে এ উক্তি করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর। এখানে সেই ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ করা হয়েছে। যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করে বলা হয়েছে তাঁরা ঈশ্বরেরই এক-একটি রূপ। তিনিই সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা আবার তিনি ব্রহ্মারও স্রষ্টা। এখানে ঈশ্বরের সৃষ্টি করার শক্তিসহ অসীম শক্তির কথা বলা হয়েছে।

সকল দেবতার শক্তি তাঁরই শক্তি। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি নিরাকার। আবার তিনিই সাকার। এ মহাশক্তিধর অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে তাই বারবার নমস্কার জানিয়ে পরম শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে।

শব্দার্থ :

যম – মৃত্যুর দেবতা। **অগ্নি** – তেজ-এর দেবতা। **বরুণ** – জল ও আকাশের দেবতা। **শশাঙ্ক** – চাঁদ। **প্রজাপতি** – ব্রহ্মা। **প্রজা**–সৃষ্টি। সুতরাং প্রজাপতি বলতে বোঝানো হয়েছে সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মাকে; অর্থাৎ ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম প্রজাপতি। প্রজাপতি ব্রহ্মারই অপর নাম।

প্রপিতামহ – পিতার পিতা= পিতামহ; ব্রহ্মাকে পিতামহ বলা হয়। প্রপিতামহ মানে পিতামহের পিতা। এখানে ঈশ্বরকে পিতামহ অর্থাৎ ব্রহ্মারও পিতা বা স্রষ্টা বলা হয়েছে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. যিনি সৃষ্টি করেন তিনি ....।

২. ঈশ্বরের কোনো .... নেই।

৩. জীবজগৎকে রক্ষা ও প্রতিপালনের দেবতা হলেন ....।

৪. আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এতো ....।

৫. ত্রেতাযুগে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন ....।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সকল সৃষ্টির পেছনে	অবতার ও দেব-দেবী
২. আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব	বহু নামে অভিহিত করেছেন
৩. ঈশ্বরের সাকার রূপ হলো	উপাসনা করেন
৪. এক ব্রহ্মকেই বিপ্রগণ	অনুভব করি
	এক অসীম শক্তি বিরাজ করছে

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. 'সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর'– কথাটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

২. পৃথিবীতে ঈশ্বর কেন অবতাররূপে আবির্ভূত হন ? ব্যাখ্যা কর।

৩. 'ঈশ্বর বহুরূপে আমাদের সম্মুখেই আছেন' – স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

৪. ঈশ্বর সাকার রূপ ধারণ করেন কেন?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ঈশ্বরের স্বরূপ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

২. 'সব সাকার রূপ একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ' – উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঈশ্বর শব্দটির অর্থ কী ?

ক. জ্ঞান খ. প্রভু
গ. স্তুতি ঘ. তপস্যা

২. কোনটির আকার আছে ?

ক. বায়ু খ. আলো
গ. শব্দ ঘ. গাছপালা

৩. ঈশ্বরের পৃথিবীতে অবতাররূপে আবির্ভূত হওয়ার কারণ –

i. দুষ্টের দমন
ii. জীবের কল্যাণ
iii. সৌন্দর্য উপভোগ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

স্পন্দন প্রতিদিন সকালে এমন একটি গ্রন্থ পাঠ করে বিদ্যালয়ে যায় যেটি উপদেশমূলক এবং যেখানে রয়েছে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব সমন্বয়।

৪. স্পন্দন প্রতিদিন কোন গ্রন্থটি পাঠ করে ?

ক. রামায়ণ খ. মনসামঙ্গল
গ. শ্রীশ্রীচণ্ডী ঘ. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

৫. উক্ত গ্রন্থ পাঠের ফলে স্পন্দন উপলব্ধি করতে পারবে –

i. আত্মা অবিনশ্বর
ii. কর্ম ত্যাগ নয় আসক্তি ত্যাগ
iii. ঈশ্বরের স্বরূপ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। অনিতা রানি গৃহে লক্ষ্মীদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করে নিয়মিত ভক্তিপূর্ণ মনে আরাধনা করেন। কিন্তু তারই প্রতিবেশী শিলাদেবী গৃহে গৌর-নিতাই-এর বিগ্রহ স্থাপন করে নিয়মিত শ্রদ্ধাভরে পূজা করেন। তাদের ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের অনুকরণ করে। তাদের সংসারে রয়েছে সদা সুখ ও শান্তি।

ক. ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার কে ?

খ. ঈশ্বর কীভাবে জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. অনিতা রানি ও শিলাদেবীর আরাধনায় ঈশ্বরের কোন রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে তা তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনিতা রানি ও শিলাদেবীর আরাধনায় 'বিগ্রহের ভিন্নতা থাকলেও মূলত ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়'–উক্তিটির মর্মার্থ তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মগ্রন্থ

ধর্মগ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে, মানুষের কল্যাণের কথা থাকে। ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, দেব-দেবীর উপাখ্যান, সমাজ ও জীবন সম্পর্কে নানা উপদেশমূলক কাহিনী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তু। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে আমাদের কল্যাণ হয়। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রভৃতি আমাদের ধর্মগ্রন্থ। বেদ আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ। এ অধ্যায় থেকে আমরা সংক্ষেপে পুরাণ ও শ্রীশ্রীচণ্ডী সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- পুরাণের অর্থ ও ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- পুরাণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারব
- মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ হিসেবে শ্রীশ্রীচণ্ডীর পরিচয় বর্ণনা করতে পারব
- শ্রীশ্রীচণ্ডীর একটি কাহিনি বর্ণনা করতে ও তার শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মাচরণে ও নৈতিকতাবোধে পুরাণের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- পুরাণে বিধৃত শিক্ষার মাধ্যমে সৎ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১ : পুরাণ

হিন্দুধর্মের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে পুরাণ অন্যতম। 'পুরাণ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে পুরাতন বা প্রাচীন। কিন্তু এখানে পুরাণ শব্দটিকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। পুরাণ হচ্ছে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক শ্রেণির ধর্মগ্রন্থ। সেখানে সৃষ্টি ও দেবতাদের উপাখ্যান, ঋষি ও রাজাদের বংশ, পৃথিবীর ভৌগোলিক পরিচিতি, তীর্থমাহাত্ম্য, দান, ব্রত, তপস্যা, আয়ুর্বেদ (চিকিৎসাশাস্ত্র) প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বেদভিত্তিক হিন্দুধর্ম ও সমাজের নানা কথা বলা হয়েছে। পুরাণ বলতে একটিমাত্র গ্রন্থ বোঝায় না। পুরাণ বহু গ্রন্থের সমষ্টি। সুতরাং পুরাণকে শুধু গ্রন্থ না বলে বলা উচিত গ্রন্থাবলি।

মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পুরাণসমূহেরও রচয়িতা। গল্প বলার ছলে পুরাণগুলো রচিত। মানুষ গল্প শুনতে ভালোবাসে। পুরাণে গল্প শোনানো হয়েছে। সে গল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মজীবন ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া। মানুষকে কল্যাণকর সুন্দর জীবন সম্পর্কে গল্পের মাধ্যমে উপদেশ ও নীতি শিক্ষা প্রদান পুরাণের মূল বিষয়বস্তু। পুরাণের সংখ্যা অনেক। তবে প্রধান প্রধান পুরাণের সংখ্যা আঠার। এই আঠারটি পুরাণ হচ্ছে – (১) ব্রহ্ম পুরাণ (২) পদ্ম পুরাণ (৩) বিষ্ণু পুরাণ (৪) শিব পুরাণ বা বায়ু পুরাণ (৫) ভাগবত পুরাণ (৬) নারদ পুরাণ (৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৮) অগ্নি পুরাণ (৯) ভবিষ্য পুরাণ (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (১১) বরাহ পুরাণ (১২) লিঙ্গ পুরাণ (১৩) স্কন্দ পুরাণ (১৪) বামন পুরাণ (১৫) কূর্ম পুরাণ (১৬) মৎস্য পুরাণ (১৭) গরুড় পুরাণ (১৮) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। এ পুরাণগুলো অনুসরণে কিছু উপ-পুরাণও রচিত হয়েছে। যেমন– বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণ।

পুরাণের মধ্যে তিনজন দেবতার মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এঁরা হলেন – ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

একক কাজ : পুরাণসমূহের নাম লেখ।

নতুন শব্দ : মার্কণ্ডেয়, ব্রহ্মবৈবর্ত, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, গরুড়।

পাঠ ২ : পুরাণের বিষয়বস্তু

পুরাণ নানা বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। শাস্ত্রে পুরাণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে –

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।

বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ।। (বায়ুপুরাণ)

অর্থাৎ পুরাণের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য – সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। সর্গ মানে সৃষ্টি। কীভাবে জীব জগতের সৃষ্টি হলো, গল্পের আকারে তা পুরাণে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিসর্গ মানে পুনরায় সৃষ্টি। জীব জগতের সবকিছুর বিনাশ হওয়ার পর আবার নতুন করে সবকিছু সৃষ্টি হয়। একেই বলে প্রতিসর্গ। দেবতা ও ঋষিদের বর্ণনাই হলো বংশ। এক্কেকবার সৃষ্টির পর তা ধ্বংস হয় এবং তার স্থলে নতুন 'সৃষ্টি' জেগে ওঠে। প্রতিটি সৃষ্টির আদি পুরুষ হলেন মনু।

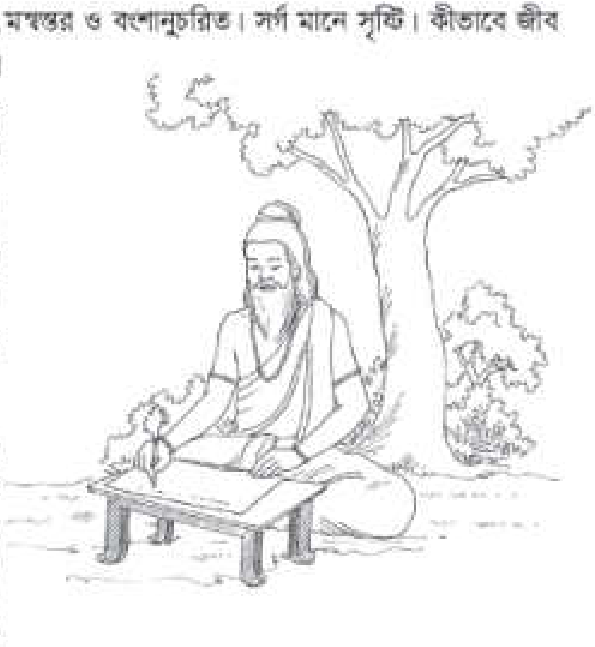

এভাবে চৌদ্দজন মনুর কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এক মনু থেকে আরেক মনুর কালের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বলা হয় মন্বন্তর। আর বংশানুচরিত হচ্ছে দেবতা, ঋষি বা বিখ্যাত রাজাদের জীবনচরিত। এ ছাড়া পুরাণে রয়েছে বর্ণাশ্রম ধর্ম, আচার অনুষ্ঠান, শ্রাদ্ধ, দান, পূজা, ব্রত ও তীর্থস্থানের বর্ণনাসহ অনেক বিষয়। মোটকথা, পুরাণের মধ্যে সেকালের ধর্ম এবং জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। আমাদের ধর্ম এবং জীবনে পুরাণের গুরুত্ব অপরিসীম। কত গল্প, কত উপাখ্যান, কত উপদেশ, জীবনের উত্থান ও পতনের কত কথা যে পুরাণে রয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না।

একক কাজ : পুরাণের বিষয়বস্তুসমূহ চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : সর্গ, প্রতিসর্গ, মন্বন্তর, বর্ণাশ্রম।

পাঠ ৩ : ধর্মাচরণ ও নৈতিকতায় পুরাণ

আমাদের প্রাত্যহিক এবং সামাজিক জীবনে পুরাণের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন ঐতিহ্যে পুরাণগুলো ধর্মশাস্ত্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক ধর্মমতে সত্য, অহিংসা, ক্ষমা, শান্তি ও ত্যাগ মানুষকে শ্রেষ্ঠতম আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। আর এসব গুণকে উপজীব্য করেই নানা গল্প, উপাখ্যানের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর করার উপদেশাবলি রয়েছে পুরাণশাস্ত্রে। সে সমস্ত উপদেশ আমাদের নীতিবোধকে জাগ্রত করে। ধর্মের পথে চলতে সহায়তা করে। সবসময় ঈশ্বরকে স্মরণ করা আমদের কর্তব্য। তাহলে পাপ আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। পুণ্যপথে থাকলে মৃত্যুর পর আমরা স্বর্গের বিষ্ণুলোকে গমন করতে পারব। চিরন্তন বৈদিক আদর্শ, একেশ্বরবাদ, লৌকিক আচারনিষ্ঠা, জাতিভেদের সংস্কার থেকে মুক্তি প্রভৃতি পুরাণে আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষযজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহিষাসুর বধ সহ কত বর্ণাঢ্য জীবনের উত্থান-পতনের কথা যে পুরাণে বর্ণিত রয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। সেসব বীরত্বপূর্ণ কাহিনী আমাদের জীবনকে সুন্দর ও পরিপাটি করে গড়ে তুলতে অনুপ্রেরণা দেয়।

একক কাজ : পুরাণের শিক্ষার মাধ্যমে জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে কী কী পদক্ষেপ নেবে?

নতুন শব্দ : চিরন্তন, একেশ্বরবাদ, দক্ষযজ্ঞ, অশ্বমেধ, বর্ণাঢ্য।

পাঠ ৪ : শ্রীশ্রীচণ্ডী

শ্রীশ্রীচণ্ডী হিন্দুধর্মাবলম্বীদের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এটি স্বতন্ত্রভাবে রচিত হয়নি। শ্রীশ্রীচণ্ডী হচ্ছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি অংশ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮৩ থেকে ৯৫ পর্যন্ত ১৩টি অধ্যায়ের নাম চণ্ডী। মার্কণ্ডেয় পুরাণের এ অংশটির নাম ছিল দেবীমাহাত্ম্য। চণ্ডীতে সাতশত মন্ত্র আছে, তাই এর আরেক নাম সপ্তশতী । মহাভারতের অংশ হয়েও গীতা যেমন পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে, তেমনি শ্রীশ্রীচণ্ডীও মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ হয়েও বিষয়বস্তু ও রচনার গুণে আলাদা গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের কাহিনি, দেবী মহামায়া, দেবী দুর্গা, দেবী অম্বিকা ও দেবী কালিকার উদ্ভব ও মহিমা বর্ণিত হয়েছে। দুর্গাপূজা ও বাসন্তী পূজার সময় বিশেষভাবে চণ্ডী পাঠ করা হয়। গীতার মতো চণ্ডীও একটি নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ।

পুরাণ মতে সর্বপ্রথম রাজা সুরথ বসন্তকালে দেবীর আরাধনা শুরু করেন। এজন্য এ পূজার নাম হয় বাসন্তীপূজা। বর্তমানে শরৎকালে যে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয় এটি মূলত অকাল বোধন। অপহৃত সীতাকে উদ্ধার করতে রাবণের সাথে যুদ্ধ করার আগে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে এ পূজার আয়োজন করেছিলেন। কালক্রমে শরতের এ পূজাই বর্তমানে অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে এবং শারদীয় দুর্গোৎসব নামে পরিচিতি লাভ করেছে। শরতের আগমনীবার্তা নিয়ে মর্ত্যে পদার্পণ করেন দেবী দুর্গা। শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিথিতে দেবী অবস্থান করেন আমাদের পৃথিবীতে।

দলীয় কাজ : শ্রীশ্রীচণ্ডীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

নতুন শব্দ : বোধন, চরিত।

পাঠ ৫ : শ্রীশ্রীচণ্ডী পূজার মাহাত্ম্য

পুরাকালে চৈত্র বংশে সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। একবার তিনি শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রাজ্যচ্যুত হন। তখন রাজা সুরথ রাজ্য ছেড়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি মেধা নামে এক মুনির আশ্রমে এলেন। তাঁর মনে জেগে রইল হারানো রাজ্যের জন্য দুঃখবোধ আর প্রজাদের জন্য মমতা। একই সময়ে সেই বনে এলেন সমাধি নামক এক বৈশ্য। ব্যবসা করে তিনি প্রচুর ধনসম্পদ করেছেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও পুত্রগণ তা অসৎ পথে ব্যয় করতে চায়। তিনি বাধা দিয়েছেন বলে তাঁর স্ত্রী ও পুত্ররা তাঁকে অপমান করেছে। তিনি মনের দুঃখে বনে চলে এসেছেন। কিন্তু তাঁকে যারা অপমান করেছে, কষ্ট দিয়েছে, তিনি তাদের ভুলতে পারছেন না। সংসার ছেড়ে এসেও তাদের জন্য তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। কেন এই কষ্ট, কেন এই অন্তরের টান ?

রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য দুজনে দুজনের মনের কথা জানলেন। দুজনেই সমব্যথী। দুজনে একসাথে গেলেন মেধা মুনির কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, কেন এমন হয়? তখন মুনি বললেন, এটা জগতেরই নিয়ম। এর নাম মায়া। আর এই মায়া মহামায়ার প্রভাব। তবে প্রসন্ন হলে মহামায়া মানুষের মঙ্গল করেন এবং মুক্তিও প্রদান করেন।

রাজা সুরথ তখন মহর্ষি মেধার কাছে জানতে চান, কে এই মহামায়া, কী তাঁর স্বরূপ? মেধা বলতে লাগলেন, এই জগৎ মহামায়ার মূর্তি হলেও তিনি নিত্য, তিনি চিরন্তন। তাঁর ধ্বংস নেই। তিনি আমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন। মেধা মুনি আরও বলেন যে, একই দেবী মহামায়া, দুর্গা, অম্বিকা ও কালিকা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। অসুর বা দৈত্যদের বিনাশ করে শান্তি স্থাপন করেছেন। দেবতারা তাঁকে স্তুতি করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মেধা মুনির কাছে থেকে দেবীর এ মাহাত্ম্য ও দেবীর পূজাপদ্ধতি শিখে নেন। এরপর তারা দুজনে মিলে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করতে থাকেন। দেবী প্রসন্ন হন। দেবীর কৃপায় রাজা সুরথ তার রাজ্য ফিরে পান। আর সমাধি বৈশ্য দেবীর কাছে কিছুই চান না। ধনসম্পদের মোহ তাঁর দূর হয়ে গেছে। তিনি চান দুঃখ থেকে মুক্তি, চান অন্তরের শক্তি। দেবীর কৃপায় সমাধি বৈশ্য শান্তি ও মুক্তি লাভ করেন।

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। *(চণ্ডী ৫ / ৩২,৩৩,ও ৩৪)*

অর্থাৎ যে দেবী সকল জীবে শক্তি রূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁকে নমস্কার,নমস্কার, নমস্কার।

একক কাজ : রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য যে কারণে ঘর ছেড়েছেন সে কারণগুলো চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : প্রসন্ন, মায়া, চিরন্তনী।

পাঠ ৬ : মহিষাসুর বধ

শ্রীশ্রীচণ্ডী বা মহামায়া দেবতাসহ মানবকুলকে তিনি দেবতাদের নানা বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

এ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী বর্ণনা করা হলো। বহুকাল পূর্বে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একবার ভীষণ যুদ্ধ বাধে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র, আর দৈত্যরাজ মহিষাসুর। দানবেরা দেবতাদের পরাজিত করল। মহিষাসুরের খুব আনন্দ। বসল স্বর্গের সিংহাসনে।

স্বর্গহারা দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রের নেতৃত্বে প্রথমে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা দেবতাদের দুঃখের কথা শুনলেন। বিষ্ণু ও শিব যেখানে বসে কথাবার্তা বলছেন, সেখানে গিয়ে উভয়কে বন্দনা করে দেবতাদের দুঃখের কথা জানালেন। ব্রহ্মার মুখে এমন মর্মান্তিক কথা শুনে বিষ্ণু আর মহেশ্বর প্রথমে ব্যথিত হলেন, তারপর ক্রুদ্ধমূর্তি ধারণ করলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবসহ অন্যান্য দেবতাদের শরীর থেকে ভয়ঙ্কর তেজ বের হলো। সেই তেজ একত্রিত হয়ে এক দিব্য নারীমূর্তির সৃষ্টি হলো। ইনিই দেবী দুর্গা। তারপর দেবগণ তাঁকে নানান অস্ত্র ও অলঙ্কার দান করলেন। এভাবে দুর্গা দেবী অপূর্ব সাজে সেজে উঠলেন। তখন গিরিরাজ হিমালয় দেবীর বাহনের জন্য দিলেন সিংহ। দেবতাগণ আনন্দে জয়ধ্বনি দিলেন, মুনিরা দেবীস্তব করলেন। অসুররা দেবীর সেই ভীষণ গর্জন শুনে তাঁর অভিমুখে তাড়াতাড়ি দ্রুতবেগে চলল। তারপর শুরু হলো দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ। মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর ও চামরসহ চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। দেবী দুর্গা কিন্তু একা। তাতে কী? রণে মত্ত মহাশক্তিমান দেবীর নিঃশ্বাসে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সৃষ্টি হলো। তখন একে একে চিক্ষুর, চামরসহ প্রায় সকলেই দেবীর অস্ত্রাঘাতে নিহত হলো। তারপর যুদ্ধে নামেন মহিষাসুর নিজে। দেবী দুর্গা আর মহিষাসুরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। অবশেষে দেবী শূলাঘাতে মহিষাসুরকে বধ করেন। দেবতারা তাঁদের স্বর্গরাজ্য আবার ফিরে পান।

ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতা দেবী দুর্গার স্তব করতে লাগলেন।

একক কাজ : মহিষাসুর বধ কাহিনীর শিক্ষা চিহ্নিত করে তোমার প্রাত্যহিক জীবনে তার প্রভাব বর্ণনা কর।

নতুন শব্দ : ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মমূর্তি, চতুরঙ্গ, গিরিরাজ।

পাঠ ৭ : শুম্ভ–নিশুম্ভ বধ

আরেকবার শুম্ভ নামের এক অসুর দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গ দখল করে নেয়। সে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের অধীশ্বর হয়ে বসে। তার ভাই নিশুম্ভ, সেনাপতি চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ প্রতিষ্ঠা করে ত্রাসের রাজত্ব। আবার দেবতারা দেবীর স্তব করে দেবীকে প্রসন্ন করেন। এবার দেবীর ক্রোধ থেকে আবির্ভূত হন দেবী অম্বিকা। ফলে তাঁর শরীর কালো হয়ে যায়। তিনি পরিচিত হন কালিকা নামে। এই কালিকা বা অম্বিকার কাছে শুম্ভ, নিশুম্ভ, রক্তবীজ, চণ্ড ও মুণ্ড পরাজিত ও নিহত হয়।

দেবতারা পুনরায় স্বর্গরাজ্য ফিরে পান। এভাবে শুধু স্বর্গের দেবতাদেরই নয়, সমগ্র জীব-জগতের কল্যাণ সাধন করেন মহাদেবী মহামায়া।

দলীয় কাজ : কালিকা বা অম্বিকার হাতে নিহত অসুরদের একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : অধীশ্বর, ত্রাস, অম্বিকা, কালিকা, রক্তবীজ।

পাঠ ৮ : শ্রীশ্রীচণ্ডীর শিক্ষা

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিতে শ্রীবিষ্ণু মধু-কৈটভকে বধ করে শান্তি স্থাপন করেছেন। মধ্যম চরিতে দেবতাদের তেজ থেকে সৃষ্ট দেবীদুর্গা মহিষাসুরসহ অসুরদের হত্যা করেছেন। দেবতারা ফিরে পেয়েছেন তাঁদের স্বর্গরাজ্য। উত্তর চরিতে শুম্ভ নিশুম্ভসহ অসুরদের বধ করেছেন দেবী অম্বিকা বা দেবী কালিকা। দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক। উল্লিখিত এ কাহিনি দুটি থেকে আমরা বেশ কয়েকটি শিক্ষা পাই।

শ্রীশ্রীচণ্ডী আমাদের শক্তি ও সাহস যোগান। দেবী দুর্গা অন্যায়কে দমন করেছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই শিক্ষা অনুকরণ করে আমরাও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব। স্বর্গচ্যুত দেবতাগণের ঐক্যই তাঁদের আবার স্বর্গ ফিরিয়ে দিয়েছে। দেবতাদের সম্মিলিত তেজ বা শক্তিই হচ্ছে মহামায়া শ্রীশ্রীচণ্ডী। এখানে একতাই শক্তির প্রমাণ মেলে। পাশাপাশি নারীশক্তির উত্থান ঘটেছে। হিন্দুধর্মে নারীকে বিশেষভাবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্ডী অর্থাৎ দেবীদুর্গা মাতৃশক্তিরূপে অধিষ্ঠিত। তিনি নারীশক্তির প্রতীক। মায়ের মতো করুণাময়ী।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর বন্দনার মাধ্যমে শত্রুর কবল থেকে দেশ ও সমাজকে রক্ষা করার অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। সকল প্রকার দুঃখ- দুর্গতির অবসানকল্পে তাঁর আরাধনা করা হয়। সকল প্রকার দুর্গতিনাশিনী বলেই তিনি শ্রীদুর্গা। দেবীকে আমরা এই বলে প্রণাম করি :

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে ॥

'তুমি সকল প্রকার কল্যাণদায়িনী। তুমি মঙ্গলময়ী, তুমি সর্বপ্রকার অভীষ্টপূর্ণকারিণী। তুমি জগতের শরণভূতা, তুমি ত্রিনয়না, তুমি গৌরী, তুমি নারায়ণী। হে দেবী, তোমাকে প্রণাম করি।'

দেবী দুর্গা শরণাগতকে রক্ষা করেন। তিনি সকল প্রকার মঙ্গল সাধন করেন। আমরাও দেবীর এ আদর্শ অনুসরণ করব। শরণাগতকে রক্ষা করব। অসহায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াব। মনের ভিতরে বসবাসকারী পশুর শক্তিকে বিনাশ করব। সমাজে গড়ে তুলব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, গড়ে তুলব আদর্শ মূল্যবোধ ও সুন্দর সমাজ।

দলীয় কাজ : 'শ্রীশ্রীচণ্ডীর শিক্ষাই ব্যক্তির অসুরশক্তিকে বিনাশ করতে পারে।' উদাহরণসহ যুক্তি দাও।

নতুন শব্দ : অভীষ্টপূর্ণকারিণী, শরণভূতা, ত্রিনয়ন, গৌরি, দুর্গতিনাশিনী ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. পুরাণ শব্দের অর্থ ....।
২. চণ্ডী হচ্ছে .... পুরাণের একটি অংশবিশেষ।
৩. বাসন্তী পূজার সময় .... পাঠ করা হয়।
৪. সুরথ .... বংশের রাজা ছিলেন।
৫. যা দেবী .... শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পুরাণে মানুষের জন্য	সপ্তশতী
২. শ্রীশ্রীচণ্ডীর অপর নাম	বেদ
৩. মহামায়া সকলকে	কল্যাণকর জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে
৪. দেবতাদের তেজঃপুঞ্জ হতে	এক দিব্য নারীমূর্তির সৃষ্টি হয়
৫. হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থের নাম হচ্ছে	শ্রী গৌরাঙ্গ
	বিপদ থেকে রক্ষা করেন

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. ধর্মগ্রন্থের ধারণাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
২. পুরাণের মূল শিক্ষা কীভাবে কাজে লাগাবে ব্যাখ্যা কর।
৩. রাজা সুরথ কেন রাজ্যহারা হলেন ?
৪. মহিষাসুর বধের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে লেখ।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. পুরাণ পাঠের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা কর।

২. পুরাণ শুধু একটি বিষয় নিয়েই রচিত হয়নি – কথাটি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

৩. শ্রীশ্রীচণ্ডীর শিক্ষা কীভাবে সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়– বুঝিয়ে লেখ।

৪. শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের মাহাত্ম্য সমাজ জীবনের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পুরাণের প্রধান বৈশিষ্ট্য কয়টি ?

ক. পাঁচ খ. বার

গ. আঠার ঘ. একুশ

২. স্বর্গ কথাটির অর্থ কী ?

ক. সুখ খ. শান্তি

গ. পুণ্য ঘ. সৃষ্টি

৩. ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হয় –

i. ঈশ্বরের বাণী ও মাহাত্ম্য

ii. সমাজ জীবনের জন্য মঙ্গলজনক উপদেশ

iii. দেবদেবীর কাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সৌমি প্রতিদিন শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করে। এতে সারাদিন তার মন ভালো থাকে। তাছাড়া সে মনে করে চণ্ডী পাঠ করার ফলে তার ও পরিবারের মঙ্গল হয়।

৪. সৌমির পঠিত গ্রন্থে কার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে ?

ক. দুর্গা খ. লক্ষ্মী

গ. সরস্বতী ঘ. শীতলা

৫. সৌমি প্রতিদিন শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করে। কারণ এর মাধ্যমে –

i. ঈশ্বরভক্তির নিদর্শন রয়েছে

ii. বিপদ থেকে পরিত্রাণের পথপ্রদর্শক

iii. ধর্ম রক্ষিত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সঞ্জয় দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির হলেও সন্তানবৎসল। সে সামান্য ব্যাপারেই রাগান্বিত হয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধায়। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। তার স্বার্থে আঘাত লাগলে মারধর পর্যন্ত করে। অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ কেড়ে নেয়। এসকল কারণে সকলেই তাকে অপছন্দ করে। অথচ প্রচুর দানধ্যান করে বলে তাকে ত্যাগ করতে পারে না। তারই ছেলে দেবজিৎ আবার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে অমায়িক ও দয়ালু এবং পরোপকার ও সমাজসেবামূলক কাজ করতে ভালোবাসে। দেবজিৎ বাবার অনৈতিক কর্মকাণ্ড একেবারেই পছন্দ করে না। অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করে বলে প্রায়ই বাবার সাথে দ্বন্দ্ব হয়।

ক. শ্রীশ্রীচণ্ডীতে কতগুলো মন্ত্র আছে?

খ. শ্রীশ্রীচণ্ডী কীভাবে পুরাণের অন্তর্গত?

গ. সঞ্জয়ের চরিত্রের সাথে মহিষাসুরের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।

ঘ. 'শ্রীশ্রীচণ্ডীর শিক্ষা দেবজিৎ–এর চরিত্রে অনেকটাই প্রতিফলিত হয়েছে'–কথাটি মূল্যায়ন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস

হিন্দুধর্ম একটি সুপ্রাচীন ধর্ম। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কোনো একজন মাত্র ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায় না। বহু সাধকের সাধনায় এ ধর্ম বিকশিত হয়ে চলছে। ঈশ্বরের স্বরূপ, তাঁর প্রতি বিশ্বাস, কর্মবাদ, জন্মান্তর, অবতারতত্ত্ব, দেব- দেবীর পূজা, মোক্ষলাভ, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ – এগুলো হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এসকল বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়েই হিন্দুধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করা যায়।

আবার হিন্দুধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা হিন্দুধর্মের ভিত্তিস্বরূপ কতিপয় বিশ্বাস ও ধর্মকৃত্যের সঙ্গে পরিচিত হই।

এ অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদে যথাক্রমে হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- হিন্দুধর্মের স্বরূপ–বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারব
- হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ঈশ্বরতত্ত্ব, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের কতিপয় মৌলিক বিশ্বাসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব (যেমন–কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ জগতের কল্যাণ এবং মোক্ষ)
- ধর্মকৃত্য হিসেবে উপাসনা পদ্ধতি, পূজা, ধর্মাচার ও সংস্কার ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মবিশ্বাস হিসেবে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- কর্মফল ও জন্মান্তর সম্পর্কে একটি ধর্মীয় উপাখ্যান ও তার শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব
- ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে নারীর মর্যাদার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- নারীর মর্যাদা প্রদানে করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব
- কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস রেখে ত্যাগী হয়ে শুভকর্মে লিপ্ত থাকব
- নারীর প্রতি মর্যাদা ও শ্রদ্ধা পোষণ করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ : হিন্দুধর্মের স্বরূপ

পাঠ ১ : হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। হিন্দুধর্মেরও বিশেষ তত্ত্ব, কতগুলো ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মকৃত্য রয়েছে, যেগুলো হিন্দুধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন– ঈশ্বরতত্ত্ব, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি, কর্মবাদ ও জন্মান্তর, অবতারবাদ, মোক্ষলাভ, জীব ও জগতের কল্যাণভাবনা ইত্যাদি। আর এ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে হিন্দুধর্মের স্বরূপ। এখন হিন্দুধর্মের স্বরূপ প্রকাশক প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে জানব।

ঈশ্বরতত্ত্ব

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়– এ বিষয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করা হয়েছে। আমরা জানি, নিরাকার ঈশ্বরকে বলা হয় ব্রহ্ম, যখন প্রভুত্ব করেন তখন তিনি ঈশ্বর। জীবকে যখন কৃপা করেন তখন তাকে বলা হয় ভগবান।

হিন্দুধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, নিরাকার ঈশ্বর প্রয়োজনে সাকার রূপ ধারণ করতে পারেন। সাকার রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে নেমে আসতে পারেন। আমরা জানি, ঈশ্বর এভাবে নেমে আসলে তাঁকে অবতার বলে। এ অবতারবাদ হিন্দুধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আবার ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি আকার পেলে তার নাম দেব-দেবী। এ দেববাদও হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

আমরা জানি, জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন। তাই জীবমাত্রই শ্রদ্ধেয় এবং তার সেবা করতে হয়। কারণ জীবসেবা যে ঈশ্বরের সেবা। আর এখানেই রয়েছে হিন্দুধর্মের নৈতিক শিক্ষার মূলভিত্তি। জীবকে ঈশ্বরজ্ঞান করলে আর কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা হানাহানির প্রশ্নই ওঠে না। জীবকে কষ্ট দেওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। কারণ জীবকে কষ্ট দেওয়া মানেই ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া।

হিন্দুধর্ম অনুসারে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, অবতার, দেব-দেবী এবং জীব– সব মিলিয়ে এক ঈশ্বর। এই হলো হিন্দুধর্মের ঈশ্বরতত্ত্ব।

একক কাজ : তোমার জানা একজন ব্যক্তির জীবসেবামূলক কর্মকাণ্ড বর্ণনা কর।

পাঠ ২ ও ৩ : ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি

হিন্দুধর্মের অনুসারীরা ঈশ্বরে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। তাঁরই নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে বিশ্বসংসার চলছে। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের সর্বময় কর্তা। তিনি পরম দয়ালু–পরম করুণাময়। তাই তাঁকে ভক্তি করা কর্তব্য। দেব- দেবীরাও ঈশ্বরের অংশ। তাই তাঁদেরও ভক্তি করা হয়।

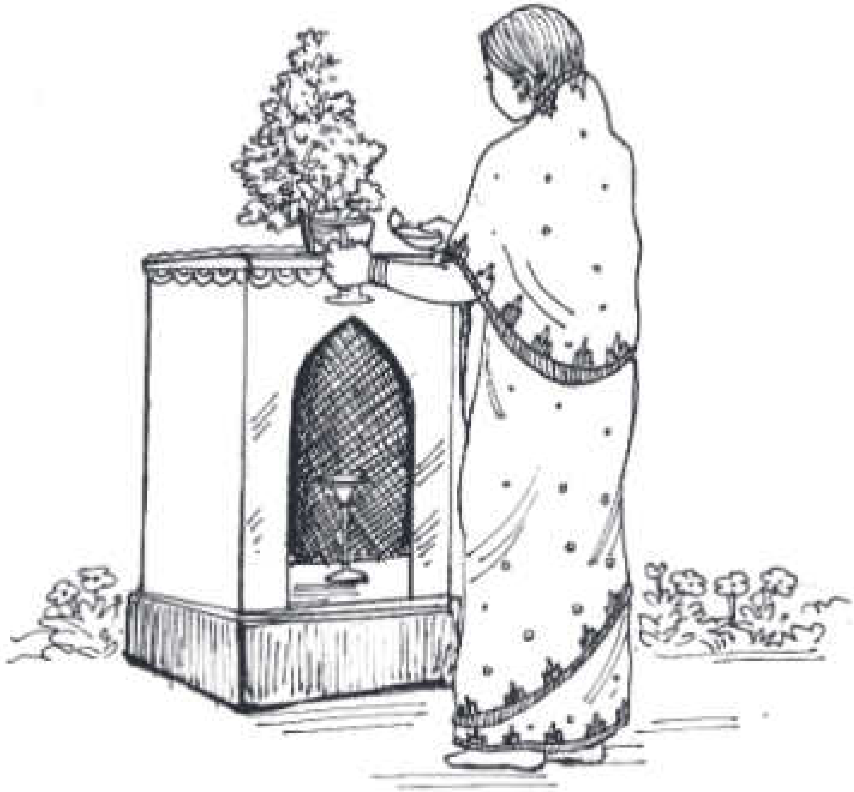

কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। সকল কিছুর পরিচালক তিনি। জীবের জীবিকা অর্জনের জন্য কর্মও তিনি সৃষ্টি করেছেন। আমরা যা কিছু করি, সে সবই কর্ম। ঘর-বাড়ি তৈরি করা, ফসল উৎপাদন করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা, লেখাপড়া করা, পূজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণা সবই কর্মের মধ্যে পড়ে। প্রত্যেক কর্মেরই ফল আছে। শুভ কর্মের ফল শুভ বা পুণ্য আবার অশুভ কর্মের ফল অশুভ বা পাপ। এই কর্মফল কিন্তু কর্মকর্তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়। ভোগ ছাড়া কোনো কর্মফল নষ্ট হয় না। এটাই কর্মবাদ। এই কর্মফল ভোগের জন্য প্রয়োজনে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। একে বলা হয় জন্মান্তর। এই কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মোক্ষলাভ

হিন্দুধর্মের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মোক্ষলাভ। 'মোক্ষ' কথাটির মানে হচ্ছে চিরমুক্তি লাভ। কোথা থেকে মুক্তি? বারবার জন্ম ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি। জীবের আত্মা ঈশ্বর বা পরমাত্মার অংশ। চিরমুক্তি লাভ করে জীবাত্মা ঈশ্বর বা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যায়। তখন আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। একেই বলে মোক্ষ।

২০২১

মোক্ষ লাভের উপায় হচ্ছে সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করা। অর্থাৎ সকল কাজ ঈশ্বরের কাজ মনে করে সম্পাদন করা, ভোগের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করা এবং জীব ও জগতের জন্য কল্যাণকর কাজ করে যাওয়া।

একক কাজ : কর্মবাদ ধারণাটি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে লেখ।

পাঠ ৪ ও ৫ : জীব ও জগতের কল্যাণভাবনা

হিন্দুধর্ম অনুসারে ধর্মাচরণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে : 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ।' অর্থাৎ ধর্মাচরণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নিজের মোক্ষলাভ ও জগতের কল্যাণ। কেবল নিজের মোক্ষলাভের বিষয়ে চিন্তা করলেই হবে না। তাহলে তা হবে একান্তই আত্মসুখের চিন্তা। হিন্দুধর্ম কেবল নিজের সুখের চিন্তা করার বিষয়টি মোটেই অনুমোদন করে না। আত্মমোক্ষ চিন্তার পাশাপাশি জগতের কল্যাণ করতে হবে। নইলে ধর্মাচরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর মোক্ষও লাভ হবে না। সুতরাং জীব ও জগতের কল্যাণ করা মোক্ষলাভের অন্যতম উপায়।

ধর্মকৃত্য

ধর্মের প্রয়োগ তার কৃত্য বা উপাসনায়, ধর্মাচারে ও আচরণীয় সংস্কারে। হিন্দুধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের নিরাকার রূপকে উপাসনা করা হয় মন্ত্র জপে ও গানে-কীর্তনে। আবার সাকার উপাসনা করা হয় দেব-দেবীর প্রতিমা নির্মাণ করে তাঁদের সুনির্দিষ্ট পূজাবিধি অনুসরণ করে পূজা করার মাধ্যমে।

হিন্দুধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে কিছু ধর্মাচার ও সংস্কার পালন করতে হয়। ধর্মাচারের মধ্যে রয়েছে নিত্যকর্ম ও যোগাসন, রয়েছে তীর্থভ্রমণ, গঙ্গা নদীসহ পবিত্র জলাশয়ে স্নান, অতিথি সেবা, তুলসী সেবা ইত্যাদি। সংস্কার হচ্ছে প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসা দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে করণীয় কিছু কাজ। যেমন– জন্মকৃত্য, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ ইত্যাদি।

সুতরাং ঈশ্বরতত্ত্ব, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি, কতিপয় মৌলিক ধারণা ও বিশ্বাস এবং ধর্মকৃত্যের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়।

একক কাজ : মোক্ষলাভের কয়েকটি উপায়ের ক্ষেত্র উল্লেখ কর

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হিন্দুধর্মের বিশ্বাস

পাঠ ১, ২ ও ৩ : কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ

আমরা জানি যেকোনো ধর্ম কতগুলো ধর্মবিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। ঐ ধর্মবিশ্বাসগুলো তার ভিত্তি। কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মের দু'টি প্রধান ভিত্তি। প্রত্যেক কর্মেরই শুভ-অশুভ যে ফল উৎপন্ন হয় সেটি কর্মকর্তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়। চলতি জন্মে কর্মফলের ভোগ যদি শেষ না হয় তাহলে কৃতকর্মের ফল ভোগের জন্যই মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়। একেই বলে কর্মবাদ।

আর জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম–একেই জন্মান্তর বলে। জন্মান্তরের পেছনে রয়েছে কর্মবাদ। জন্মান্তরে কর্মফল ভোগের একটি ধর্মীয় উপাখ্যান এখন বর্ণনা করা হলো।

অনেক অনেক কাল আগে বিষ্ণুভক্ত এক রাজা ছিলেন। তার নাম ছিল ভরত। বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনাকে তিনি বিয়ে করেন। তাদের সংসারে পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। রাজা ভরত পুত্রদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দেন। এরপর তিনি তপস্যার জন্য বনে গমন করেন। সাধনার দ্বারা রাজা ভরত হলেন সাধকভরত – মুনিভরত।

একদিন তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। সেখানে দেখতে পেলেন এক হরিণী জল পান করতে এসেছে। হরিণীটির বাচ্চা প্রসবের সময় হয়ে এসেছে। এমন সময় বনের ভেতর থেকে সিংহের গর্জন শোনা গেল। ভয়ে হরিণী নদীর তীরে পড়ে যায় এবং তার গর্ভ থেকে এক বাচ্চা হরিণের জন্ম হয়। হরিণী মৃত্যুবরণ করে। এই দৃশ্য দেখে ভরতমুনি দয়াযুক্ত চিত্তে হরিণশিশুটিকে রক্ষার জন্য নিয়ে আসেন তার আশ্রমে। মাতৃহীন হরিণশিশুর যত্নে, আদরে তার সময় কাটে। এর ফলে মুনির তপস্যা আর রইল না। এই হরিণশিশুর চিন্তা করতে করতে তিনি দেহত্যাগ করেন। শাস্ত্রে বলে মানুষ যেরূপ চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন তিনি সেই রকম জন্মলাভ করেন। তাই ভরতমুনিকেও হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করতে হলো। তবে হরিণ হয়ে জন্মালেও তাঁর পূর্বজন্মের কাহিনী স্মরণে ছিল। তাই হরিণজীবনেও তপস্বীদের আশ্রম প্রান্তে থেকে ধর্মকথা, তপস্যার কথা শুনতে শুনতে দেহত্যাগ করে পুনরায় মনুষ্যজনম প্রাপ্ত হন এবং ঈশ্বর আরাধনা করে তার অনুগ্রহ লাভ করেন।

কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। এই ধর্মীয় বিধান বিজ্ঞানসম্মত। প্রত্যেক কাজেরই একটা কারণ বা হেতু থাকে। আর যখনই একটা কারণ এসে পড়ে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আসে কাজের ফল। এক বালক বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে আনন্দ পায়। কিন্তু সে জানে না যে বৃষ্টিতে ভিজলে এবং ঠাণ্ডা জলে দীর্ঘ সময় থাকলে তার অসুখ হতে পারে। সে না জানলেও কাজের ফল হিসেবে তাকে অসুস্থ হতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে কর্মের সঙ্গে কর্মের ফল সম্বন্ধযুক্ত। কর্ম করলেই কর্মফল আসে। আর সে কর্মফল অবশ্যই কর্মকর্তাকে ভোগও করতে হয়। এই পরিবর্তনহীন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা সবাই সচেতন হব এবং শুভ-অশুভ কর্ম বিবেচনা করে

জীবনের পথে শুভ কর্মের অনুশীলন করব।

একক কাজ : জন্মান্তরে কর্মফল ভোগের ধর্মীয় উপাখ্যানের শিক্ষা তোমার জীবনে কীভাবে প্রতিফলন করবে ?

পাঠ ৪ ও ৫ : নারীর মর্যাদা

জীবনে নারী-পুরুষের নিজস্ব অবস্থান রয়েছে। পুরুষের কর্মস্থল প্রায়ই থাকে গৃহের বাইরে। অপরদিকে অধিকাংশ নারীর কর্মস্থল তাঁর সংসারকে নিয়ে গড়ে ওঠে। জন্মের পরে কন্যা মা-বাবার স্নেহ-যত্নে বেড়ে ওঠে, শিক্ষা গ্রহণ করে। বিবাহিত জীবনে সে স্বামীর ঘরে যায়, স্বামীর সংসার তাকে দেখতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে এই মহিলাকেই পুত্রকন্যাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এইভাবে সমাজের একজন নারীর তিনটি অবস্থা দেখা যায়-কন্যা, বধূ ও মাতা। বধূ হিসেবে স্বামীর সংসার দেখা-শোনা, ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন, শিক্ষার ব্যবস্থা করা তার কাজ হয়ে পড়ে। এ কাজের মধ্য দিয়ে নারী তার সংসারধর্ম পালন করেন। একজন আদর্শ মায়ের হাতে আদর্শ সন্তান গড়ে উঠতে পারে। সন্তানের কাছে মায়ের মতো আর বন্ধু নেই। রোগে, শোকে, আনন্দে, উৎসবে মা-ই হচ্ছেন সন্তানের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, উৎসাহদাতা ও আনন্দের উৎস। এমন মাতৃরূপী নারীর প্রতি সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে মাকে শ্রদ্ধা করা, তাঁর সেবা শুশ্রূষা করা। হিন্দুধর্মের অন্যতম ধর্মশাস্ত্র হচ্ছে মনুসংহিতা। সেখানে সংসারজীবনে কেমন করে শান্তি এসে থাকে তার বর্ণনা দেওয়া আছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে সংসারে নারীরা আনন্দে-উৎসবে সুখে জীবন যাপন করে সে সংসার ঈশ্বরের কৃপায় শান্তি সমৃদ্ধিতে ভরে উঠে। তাই নারীদের প্রতি সদয় শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ ধর্মের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা।

অন্যদিকে হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের প্রকৃতি বা শক্তি হচ্ছে নারী। এই শক্তিকে বলা হয় আদ্যাশক্তি মহামায়া। শক্তি ছাড়া কোনো কাজ হয় না। আর সেই শক্তির দেবী হচ্ছেন নারী। এভাবে নারী শক্তির প্রতি হিন্দুধর্ম মর্যাদা প্রকাশ করেছে।

ধর্মগ্রন্থে আরও বলা হয়েছে, ঈশ্বর সৃষ্টির জন্য নিজেকে দুভাগ করলেন। এক ভাগ পুরুষ এবং এক ভাগ নারী। এ ভাগ কিন্তু সমান সমান, বেশি বা কম নয়।

'অর্ধনারীশ্বর' নামক একটি প্রতিমায় দেখা যায়, অর্ধেক শিব ও অর্ধেক পার্বতী (দুর্গা)। এর তাৎপর্যও পুরুষ ও নারীর সমতা এবং নারীর প্রতি পূর্ণ মর্যাদাবোধের প্রকাশ।

মহাভারতে বলা হয়েছে, যে পরিবারে নারীর প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করা হয়, দেবতারা সে পরিবারে আনন্দে বাস করেন। (অনুশাসন পর্ব, ৪৬/৫)। অন্যদিকে কোনো পরিবারে নারী যদি অশ্রদ্ধা পান, তাহলে সমস্ত শুভকর্ম নিষ্ফল হয়। (অনুশাসন পর্ব, ৪৬/৬)।

নারীর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের উপায় হলো, তাঁকে পরমা প্রকৃতি দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ মনে করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা এবং ধর্মগ্রন্থের অনুশাসন মেনে সমতাপূর্ণ আচরণ করা। সর্বোপরি নারীর মধ্যেও আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন, তাই নারীর প্রতি মর্যাদা প্রকাশ তো ঈশ্বরের প্রতি মর্যাদা প্রকাশ।

হিন্দুধর্মগ্রন্থসমূহে নারীর প্রতি মর্যাদাবোধের যে সকল দৃষ্টান্ত রয়েছে, আমরা তা অনুসরণ করব। সর্বক্ষেত্রে সম অধিকার নারীর প্রাপ্য– এ সত্য মনে রেখে আমরা নারীর প্রতি মর্যাদা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হব।

কর্মবাদ ও জন্মান্তর, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ, ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ ও নরকের ধারণা ইত্যাদি আরও অনেক বিশ্বাসের ওপর হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত। আর এ ধর্মবিশ্বাসগুলোর লক্ষ্য হলো মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষরূপে গড়ে তোলা এবং পরিবার ও সমাজকে শৃঙ্খলাপূর্ণ ও শান্তিময় করে গড়ে তোলার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করা।

দলীয় কাজ : নারীকে কীভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভূষিত করা যেতে পারে তার কয়েকটি উপায় লেখ।

নতুন শব্দ : কর্মযোগ, মাহাত্ম্য, অর্ধনারীশ্বর ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ঈশ্বরের সাকার রূপে অবতরণ করাকে .... বলা হয়।

২. জীবসেবা করলে .... সেবা করা হবে।

৩. হিন্দুধর্ম মতে ঈশ্বরের প্রকৃতি বা শক্তিকে বলা হয় ....।

৪. কর্ম অনুসারে .... ভোগ করতে হয়।

৫. ঈশ্বর ভগবান তখনই যখন জীবকে .... করেন।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বাম পাশ	ডান পাশ
১. জীবের মধ্যে ঈশ্বর	বিষ্ণুভক্ত ছিলেন
২. চিরমুক্তিলাভ মানেই হচ্ছে	আমাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন
৩. রাজা ভরত	আত্মারূপে অবস্থান করেন
৪. মাতৃরূপী ঈশ্বর	মোক্ষলাভ
	পরিত্রাণ লাভ

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. তোমার প্রাত্যহিক জীবনের কয়েকটি শুভকর্মের ব্যাখ্যা দাও।

২. জন্মান্তরবাদ বলতে কী বোঝায় ?

৩. ভরত মুনিকে হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল কেন ?

৪. কীভাবে নারীর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা যায় ?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. 'ব্রহ্ম, অবতার, দেব-দেবী এবং জীব-সব মিলিয়ে এক ঈশ্বর'– ব্যাখ্যা কর।
২. 'কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ পরস্পর সম্পর্কিত'– বুঝিয়ে লেখ।
৩. 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'– সংস্কৃত বাক্যটি ব্যাখ্যা কর।
৪. 'মাতৃরূপই একজন নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থান'– দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঈশ্বর জীবের মধ্যে কীরূপে অবস্থান করেন ?

ক. আত্মা খ. প্রাণ
গ. বায়ু ঘ. সাকার

২. মোক্ষলাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে –

i. জীবের কল্যাণ করা
ii. নিজের মঙ্গলের জন্য কাজ করা
iii. জগতের হিতসাধন করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i খ) ii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩. পারিবারিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্য কর্তব্য কী ?

ক. বৃদ্ধবয়সে মা-বাবাকে সেবা করা
খ. পারিবারিক স্বচ্ছলতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া
গ. পরিবারের নারী সদস্যদের যথাযোগ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা
ঘ. অতিথি ও প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা করা।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সৌমিরানি একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি সকল কাজ করার পাশাপাশি নিজের সন্তানকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অত্যন্ত সচেতন। কারণ তিনি জানেন যে, সন্তানকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মায়ের অবদানই শ্রেষ্ঠ।

৪. সন্তানকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সৌমিরানির করণীয় –

i. উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান
ii. নৈতিক চরিত্র গঠনকে গুরুত্ব দেওয়া
iii. স্বাবলম্বী করে তোলা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

৫. সৌমিরানির পারিবারিক জীবনে আচরণিক যে অবস্থানটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে তা হলো –

i. কন্যারূপে
ii. বধূরূপে
iii. মাতৃরূপে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i ও ii

১. সৃজনশীল প্রশ্ন

অধীরবাবু কর্মকে ধর্ম জ্ঞান করেন। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলের জন্য তিনি আর্থিক, পারিবারিক বিভিন্ন কাজে সহায়তা করেন। তবে তিনি মা, বোন এবং স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকারের প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাশীল। এ কাজের জন্য তিনি তাদের কাছে কিংবা সৃষ্টিকর্তার নিকট কোনো কিছু প্রত্যাশা করেন না। তার ধারণা মানুষের জন্ম একবারই হয়। পাপ–পুণ্য সবই এ পৃথিবীতে ঘটে।

ক. 'মোক্ষ' কথাটির মানে কী ?

খ. 'জন্মান্তরের পেছনে রয়েছে কর্মবাদ'– কথাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. অধীরবাবুর আচরণে হিন্দুধর্মের যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মা, বোন ও স্ত্রীর প্রতি অধীরবাবুর আচরণ যথার্থ: কথাটি তোমার পঠিত 'নারীর মর্যাদা' বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

নিত্যকর্ম ও যোগাসন

প্রাতঃকাল থেকে রাত্রিকাল পর্যন্ত প্রতিদিনের অবশ্য করণীয় কাজকে নিত্যকর্ম বলে। নিত্যকর্ম ছয় প্রকার– প্রাতঃকৃত্য, পূর্বাহ্ণকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্ণকৃত্য, সায়াহ্নকৃত্য ও নৈশকৃত্য। এ সমস্ত কর্মের মাধ্যমে আমাদের শরীর ও মন শান্ত, পবিত্র, নির্মল, কর্মঠ ও উত্তম ভাবনায় পরিপূর্ণ থাকে। আমাদের এই দেহ-মনকে সুস্থ রাখতে সাধনার প্রয়োজন। তাই প্রতিদিন নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং দেহকে বলশালী ও রোগমুক্ত রাখতে এবং চিত্তচাঞ্চল্য দূর করতে সুখাসন, শলভাসন, পশ্চিমোত্তানাসন অনুশীলনের উপকারিতা অনস্বীকার্য। এই অধ্যায়ে নিত্যকর্মসমূহ ও যোগাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

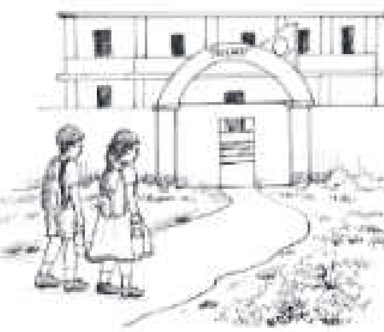

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- নিত্যকর্মগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব
- শলভাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- শলভাসনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- পশ্চিমোত্তানাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- পশ্চিমোত্তানাসনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- শলভাসন ও পশ্চিমোত্তানাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এটি নিয়মিত অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হব
- শলভাসন ও পশ্চিমোত্তানাসন অনুশীলন করতে পারব।

পাঠ ১, ২, ৩ ও ৪ : নিত্যকর্মসমূহ

প্রাতঃকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সময়কালকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– (১) প্রাতঃ (২) পূর্বাহ্ণ (৩) মধ্যাহ্ন (৪) অপরাহ্ণ (৫) সায়াহ্ন ও (৬) নৈশ।

সময়কালের এই ছয়টি বিভাগের দিকে লক্ষ রেখে নিত্যকর্মকেও ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– (১) প্রাতঃকৃত্য (২) পূর্বাহ্ণকৃত্য, (৩) মধ্যাহ্নকৃত্য (৪) অপরাহ্ণকৃত্য (৫) সায়াহ্নকৃত্য ও (৬) নৈশকৃত্য।

১। **প্রাতঃকৃত্য** : সূর্যোদয়ের কিছু আগে ঘুম থেকে উঠে বিছানার উপরে পূর্ব বা উত্তরমুখ হয়ে বসে ঈশ্বর বা দেব- দেবীদের স্মরণ করে মন্ত্র পাঠ করতে হয়। এ জন্য ধর্মগ্রন্থে মন্ত্র বা শ্লোক রয়েছে। নিচে একটি মন্ত্র সরলার্থসহ দেয়া হলো :

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতুঃ
কুর্বন্তু সর্বে মম সুপ্রভাতম্ ॥

সরলার্থ : ব্রহ্মা, মুরারি (কৃষ্ণ), ত্রিপুরাসুরের বিনাশকারী শিব, সূর্য, চন্দ্র, ভূমিপুত্র বুধ, গুরু বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু সকলে আমার প্রভাতটিকে যেন সুন্দর করেন।

একক কাজ : প্রাতঃকালের মন্ত্রটি আবৃত্তি কর।

এরপর গুরুকে স্মরণ করে ঘর থেকে বাইরে এসে পৃথিবীকে ও সূর্যকে প্রণাম করতে হয়। প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় পিতামাতাকে প্রণাম করতে হয়। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে, স্নান করে পরিষ্কার জামাকাপড় পরতে হয়।

২। **পূর্বাহ্ণকৃত্য** : প্রাতঃকৃত্যের পরে এবং মধ্যাহ্ন বা দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে যে সকল কাজ করা হয়, তাই পূর্বাহ্ণকৃত্য। এই সময়ে প্রার্থনা, উপাসনা ও পূজা করতে হয়। এই কৃত্য প্রতিদিন পরিবারের সকলেরই পালন করা উচিত। তারপর দিনের অন্যান্য কাজকর্ম করতে হয়। যেমন–আহার করা, কর্মস্থলে যাওয়া, গৃহস্থালির কাজকর্ম করা, অধ্যয়ন বা বিদ্যালয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

একক কাজ : তোমার পূর্বাহ্ণকৃত্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

৩। **মধ্যাহ্নকৃত্য** : পূর্বাহ্ণের পর এবং অপরাহ্ণের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে যে কাজ করা হয়, তা-ই মধ্যাহ্নকৃত্য। এই সময়টাকে বলে দুপুর। দুপুরের কাজ খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রাম করা। যদি দুপুরে কোনো অতিথি আসে তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে খাওয়াতে হয়। কারণ শাস্ত্রে বলে, অতিথি নারায়ণ, অতিথির সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

৪। **অপরাহ্ণকৃত্য** : দুপুরের পর এবং সায়াহ্নের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে যে কাজ করা হয় তাকেই বলে অপরাহ্ণকৃত্য। এই সময়টাকে বলে বিকাল, এই সময়ে নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় কাজ করতে হয়। এছাড়া প্রতিদিন বিকেলে খেলাধুলা, ব্যায়াম বা ভ্রমণ করলে শরীর ভালো থাকে।

৫। **সায়াহ্নকৃত্য** : সায়াহ্ন মানে সন্ধ্যা। সন্ধ্যাকালে আবার হাত-মুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হতে হবে। তারপর ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে। সাধারণ কথা, স্তব বা গানে শ্রদ্ধা-ভক্তিতে ঈশ্বরের গুণগান করতে হবে। নিচে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান তুলে ধরা হলো :

ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।
চিত্ত মম যখন যেথা থাকে সাড়া যেন দেয় সে তব ডাকে,
যত বাঁধন সব টুটে গো যেন
প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।
বাহিরের এই ভিক্ষা-ভরা থালি এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,
অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে।
প্রভু, তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।
হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর, এ জীবনে যা কিছু সুন্দর
সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে
প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে ॥

দলীয় কাজ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের শিক্ষাসমূহ চিহ্নিত কর।

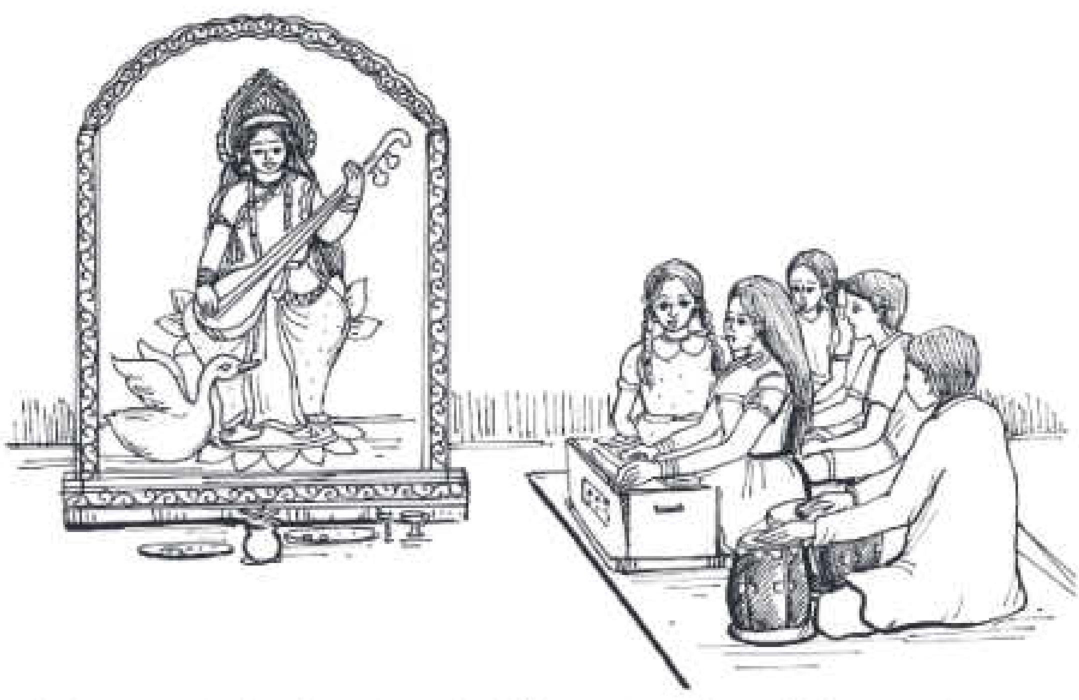

৬। **নৈশকৃত্য** : সন্ধ্যার পর থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত সময়কালের কাজকে নৈশকৃত্য বলা হয়। এ সময়ে অধ্যয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করা হয়। রাত্রের আহার গ্রহণ করতে হয়। তারপর শয়ন করে শ্রীবিষ্ণুর 'পদ্মনাভ' নামটি উচ্চারণ করতে হয়। কারণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে–'শয়নে পদ্মনাভঞ্চ'।

নতুন শব্দ : প্রাতঃকৃত্য, মুরারি, রাহু, কেতু, পূর্বাহ্ণকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্ণকৃত্য, সায়াহ্ন।

পাঠ ৫ ও ৬ : শলভাসন

শলভাসনের ধারণা : 'শলভ' শব্দের অর্থ পতঙ্গ। আসন অবস্থায় দেহটি অনেকটা পতঙ্গের মতো দেখায়, তাই আসনটির নাম শলভাসন।

অনুশীলন পদ্ধতি : মাটির উপর বা শক্ত জায়গায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। চিবুক মাটির উপর থাকবে। দুহাত সোজা করে দেহের দুপাশে উরুর নিচে এবং হাতের তালু দুটো মাটিতে সমান করে পাতা থাকবে, আঙুলগুলো গায়ে গায়ে লেগে থাকবে। হাঁটু, উরু ও পায়ের গোড়ালি জোড়া রাখতে হবে।

এরপর শ্বাস ধীরে ধীরে গ্রহণের সাথে হাঁটু ভাঁজ না করে উরু ও পা দুটি সোজা রেখে মেঝে থেকে দেড় থেকে দুহাত উপরে তুলতে হবে। এই অবস্থায় ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। আসনটি ৪/৫ বার অনুশীলন করতে হবে এবং প্রতিবার শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

একক কাজ : শলভাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

প্রভাব : কোমর ও মেরুদণ্ডের যে কোনো ব্যথায় এই আসন উপকারী। আসনটি মেরুদণ্ডকে নমনীয় ও সবল করে, তলপেট ও পিঠের নিচের অংশের মেদ কমায়। এতে উরু ও কোমরের পেশির গঠন সুন্দর হয়, হৃৎপিণ্ড সবল হয়। আসনটি বাত বা সায়টিকার এক আশ্চর্য প্রতিষেধক। ক্ষুধামন্দা অম্ল, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি রোগ নিরাময়ে এই আসন ফলপ্রদ। এই আসনে গ্যাস্ট্রিক সমস্যা দূর হয়, পেটে বায়ুর প্রকোপ কমে, পেটফাঁপা সারে, হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। যারা কোলকুঁজো, এই আসন তাদের জন্য বিশেষ উপকারী।

দলীয় কাজ : শলভাসনের উপকারিতা লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : শলভাসন, পতঙ্গ, চিবুক, আশ্চর্য, প্রতিষেধক, নমনীয়, অম্ল, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রকোপ, ফলপ্রদ, কোলকুঁজো।

পাঠ ৭ ও ৮ : পশ্চিমোত্তানাসন

পশ্চিমোত্তানাসনের ধারণা : যে আসনটিতে পশ্চিম অর্থাৎ শরীরের পিছন দিকে বেশি ব্যায়াম হয়, তার নাম পশ্চিমোত্তানাসন।

অনুশীলন পদ্ধতি : দু পা সোজা করে সামনের দিকে ছড়িয়ে বসতে হবে। এরপর দুহাত সোজা করে ডান হাতের বুড়ো আঙুল, তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল এবং বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল, তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল শক্ত করে চেপে ধরতে হবে। মেরুদণ্ড টানটান ও পিঠ সমান রাখতে হবে। এরপর চোখ বন্ধ রেখে হাঁটুতে কপাল ঠেকাতে হবে। সেই সঙ্গে হাতের কনুই ভাঁজ করে হাঁটুর পাশে রাখতে হবে। পেট ও বুক যথাসম্ভব উরুর সঙ্গে মিশে থাকবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এ অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর নিঃশ্বাস নিয়ে হাঁটু থেকে মাথা তুলে, দু পায়ের বুড়ো আঙুল ছেড়ে দিয়ে ৩০ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে ৩/৪ বার অনুশীলন করতে হবে।

একক কাজ : পশ্চিমোত্তানাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

প্রভাব : আসনটি মেরুদণ্ড ও পেটের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই আসনে গোটা মেরুদণ্ড সতেজ হয়। হাঁটুর পিছন দিকের পেশি এবং পেটের সমস্ত যন্ত্র মজবুত হয়, তাদের কর্মদক্ষতা বাড়ে। এই আসনে অম্বল, ক্ষুধামন্দা, আমাশয়, পেটে বায়ু প্রভৃতি রোগের উপশম হয়, হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। স্নায়ুদৌর্বল্য, সায়টিকা, বাত ও ডায়াবেটিস রোগেও এই আসনে উপকার পাওয়া যায়। এতে কিডনিও ভালো থাকে। পেট ও কোমরের মেদ কমিয়ে দেহের গড়ন সুন্দর করে। কিশোর– কিশোরীদের লম্বা হতে সাহায্য করে। মনের অস্থিরতা, চঞ্চলতা ও উদ্যমহীনতা নিবারণে এই আসন খুবই উপকারী।

যাঁদের যকৃত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে বা যাঁরা এপেন্ডিসাইটিস বা হার্নিয়ায় ভুগছেন, তাদের এই আসনটি অনুশীলন করা নিষেধ।

দলীয় কাজ : পশ্চিমোত্তানাসন অনুশীলনে যে সমস্ত উপকার পাওয়া যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : পশ্চিমোত্তানাসন, তর্জনী, মধ্যমা, টানটান, সতেজ, অম্বল, উদ্যমহীনতা, উপশম, স্নায়ুদৌর্বল্য, সায়টিকা, যকৃত, এপেন্ডিসাইটিস, হার্নিয়া।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় .... প্রণাম করতে হয়।
২. অতিথির সেবা করলে .... সেবা করা হয়।
৩. সায়াহ্ন মানে ....।
৪. ধ্যানের পক্ষে উত্তম ....।
৫. শলভ শব্দের অর্থ ....।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সাধারণ কথা, স্তব বা গানে	বেশি ব্যায়াম হয়
২. দুপুরের আহার গ্রহণ ও বিশ্রাম নেওয়া	ঈশ্বরের গুণগান করতে হয়
৩. পশ্চিমোত্তানাসনে শরীরের পিছন দিকে	মধ্যাহ্নকৃত্য
	উপুড় করে রাখতে হবে

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. প্রাতঃকৃত্য কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

২. পূর্বাহ্নকৃত্যের করণীয়গুলো কী ?

৩. শরীর-মনের ওপর পশ্চিমোত্তানাসন নিয়মিত অনুশীলনের প্রভাব চিহ্নিত কর।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. নিত্যকর্মসমূহ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

২. কীভাবে শলভাসন অনুশীলন করবে ব্যাখ্যা কর।

৩. শরীর-মনের ওপর শলভাসনের নিয়মিত অনুশীলনের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোন অবতারের অপর নাম মুরারি ?

ক. রাম — খ. কৃষ্ণ

গ. নৃসিংহ — ঘ. শ্রীচৈতন্য

২. মধ্যাহ্নকৃত্যের পর কোন কৃত্য ?

ক. পূর্বাহ্ন — খ. অপরাহ্ণ

গ. সায়াহ্ন — ঘ. নৈশ

৩. পশ্চিমোত্তানাসন নিয়মিত অনুশীলনে —

i. শক্তি বাড়ে

ii. খিল ধরে

iii. পেশির স্থিতিস্থাপকতা ফিরে আসে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii — খ) ii ও iii

গ) i ও iii — ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রমা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। সে লেখাপড়া ও আচরণে খুব ভালো। কিন্তু সে সবসময় কুঁজো হয়ে থাকে। একদিন শিক্ষক তাকে একটি আসন অনুশীলনের পরামর্শ দেন। রমা শিক্ষকের পরামর্শ মেনে চলে অনেক উপকার পেয়েছে।

৪. শিক্ষক রমাকে কোন আসন অনুশীলনের পরামর্শ দেন ?

ক. পদ্মাসন খ. সুখাসন

গ. শলভাসন ঘ. পশ্চিমোত্তানাসন

৫. উক্ত আসনটি অনুশীলনের ফলে রমা যে উপকার পেয়েছে তা হলো –

i. মেরুদণ্ড সোজা হওয়া

ii. হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করা

iii. কোমরের পেশির গঠন সুন্দর হওয়া।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সুজনের শারীরিক গঠন খর্বাকৃতি। কিন্তু এ বয়সে মোটা হওয়ায় সুজনের বিভিন্ন কর্মে অসঙ্গতি দেখা দেয়। সুজনের মা-বাবা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে যোগাসন অনুশীলনের মাধ্যমে শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করার পরামর্শ দেন। সুজন ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলে অনেক উপকার পেয়েছে।

ক. কখন ঘুম থেকে উঠতে হবে ?

খ. সায়াহ্নকৃত্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

গ. সুজন কোন যোগাসনটি নিয়মিত অনুশীলন করে সুফল পেয়েছে ? উক্ত আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সুজনের অনুশীলনকৃত আসনটির উপকারিতা বহুমুখী'– বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ

ঈশ্বর নিরাকার হলেও জগতের প্রয়োজনে বিভিন্ন রূপে তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি যখন আকার পায় তখন তাকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। যেমন-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, মনসা প্রভৃতি। এ সকল দেব-দেবী ঈশ্বরের বিশেষ গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। আমরা এসকল দেব-দেবীর পূজা করে থাকি।

পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা করা। কিন্তু হিন্দুধর্মে পূজা শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূজা বলতে বোঝায় ঈশ্বরের প্রতীক বিভিন্ন দেব-দেবীকে ফুল ও নানা উপকরণ দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন বা প্রশংসা করা। এজন্য মন্ত্র পাঠ করে পুষ্পাঞ্জলি, আরতি এবং ধ্যান করাসহ বিভিন্ন মাঙ্গলিক কাজ করা হয়।

পার্বণ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠান। পূজা-পার্বণ বলতে আমরা বুঝি, যে পর্বগুলো পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে এবং ঈশ্বর বা দেব-দেবীর প্রতি ভক্তির সৃষ্টি করে। পূজা-পার্বণের এসকল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে প্রতিমা নির্মাণ, মন্দির সাজানো, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যের আয়োজন বিশেষ করে ঢাক, ঢোল, ঘন্টা, কাঁশি, শঙ্খ এবং ভক্তদের সাথে ভাব বিনিময়, কিছুটা বিচিত্রধর্মী খাওয়া-দাওয়া, বিভিন্ন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন, পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান ইত্যাদি। দেবদেবীর পূজা করার জন্য বিশেষ পূজাবিধি অনুসরণ করতে হয় যা বিভিন্ন দেব ও দেবী অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ অধ্যায়ে আমরা পূজাবিধির ধারণা, লক্ষ্মী পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা এবং এসব পূজার গুরুত্ব, পদ্ধতি, পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণামমন্ত্র এবং পূজার শিক্ষা ও প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- পূজাবিধির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- লক্ষ্মীদেবীর পরিচয় বর্ণনা করতে পারব
- লক্ষ্মীদেবীর পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- লক্ষ্মীপূজার পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণামমন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় বলতে পারব এবং বাংলা অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- জীবনাচরনে লক্ষ্মীপূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- বিশ্বকর্মা দেবের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব
- বিশ্বকর্মা দেবের পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- বিশ্বকর্মা পূজার পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণামমন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় বলতে পারব এবং বাংলা অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- পারিবারিক ও সমাজ জীবনে বিশ্বকর্মা পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- লক্ষ্মী ও বিশ্বকর্মা পূজার্চনায় উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১, ২ ও ৩ : পূজাবিধি

হিন্দুধর্মে পূজা করার জন্য কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এ সকল নিয়মনীতিগুলোকে পূজাবিধি বলে। প্রতিমা, ঘট, পট (ছবি), মণ্ডল, শালগ্রাম, পুস্তক, শিবলিঙ্গ ও জল এ আটটি বস্তুর যে- কোনো একটি বস্তুতে পূজা করা যায়। এ আটটি বস্তুকে পূজার আধার বলে। এ কারণে পূজার আধার হিসেবে এগুলোর কোনো-না-কোনোটির ব্যবহার দেখা যায়। পূজা করার মৌলিক দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে দেব-দেবীর আবাহন, ধ্যান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পূজামন্ত্র পাঠ, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, প্রার্থনামন্ত্র পাঠ, প্রণামমন্ত্র পাঠ ও বিসর্জন। এ ছাড়াও যে কোনো পূজা করার পূর্বে পঞ্চদেবতার পূজা করা হয়। পঞ্চদেবতা হচ্ছেন : শিব, বিষ্ণু, সূর্য, অগ্নি ও কালী। পূজা করার জন্য বেশকিছু সাধারণ বিধি বা নিয়ম-নীতি রয়েছে । নিচে কিছু কিছু বিধির উল্লেখ করা হলো–

১. **আসনশুদ্ধি ও আচমন** : এ বিধি অনুসারে পূজা করার পূর্বে পূজার উপকরণসমূহ শুদ্ধি করে নিতে হয়। শুদ্ধি করা বলতে দোষমুক্ত করাকে বোঝানো হয়। এ ক্ষেত্রে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, করশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি করে পূজার ঘট স্থাপন করতে হয়। অতঃপর আচমন করতে হয়। আচমন বলতে হাত, পা, চোখ পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে বিশুদ্ধ জল তিনবার পান করতে হয়। এ সময় নির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করতে হয় । আচমনের সাথে ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করতে হয়। অতঃপর স্বস্তিবাচন। স্বস্তিবাচন বলতে শুভকামনা বোঝানো হয়। সাধারণত পুরোহিত পূজার শুরুতে যে শুভ বা মঙ্গল কামনা করেন তাকে স্বস্তিবাচন বলে।

২. **সংকল্প গ্রহণ** : এ বিধি অনুসারে সঠিকভাবে পূজাকার্য সম্পাদনের জন্য সংকল্প গ্রহণ করতে হয়। সংকল্প শব্দের অর্থ প্রতিজ্ঞা বা দৃঢ় ইচ্ছা।

৩. **পূজায় অভীষ্ট দেব-দেবীকে আমন্ত্রণ জানানো, চক্ষুদান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা:** পূজার প্রথম বিধি অনুসারে নির্দিষ্ট দেব-দেবীর প্রতিমা বা পট নির্দিষ্ট করে পূজা ও প্রার্থনা গ্রহণের জন্য হৃদয় দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিশ্বাস করা হয়, অভীষ্ট দেব-দেবী নির্দিষ্ট প্রতিমার মধ্যে অবস্থান করছেন। প্রতিমায় চক্ষু দান করে নিতে হয়। অতঃপর অভীষ্ট দেব-দেবীর উদ্দেশে বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৪. **অভীষ্ট দেব-দেবীর ধ্যান, পূজামন্ত্র পাঠ, পুষ্পাঞ্জলি, প্রার্থনা, আত্মসমর্পণ ও নমস্কার প্রদান** : এ বিধি অনুসারে মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে দেব-দেবীর উদ্দেশে ধ্যান, পূজা, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ, প্রার্থনা ও প্রণাম করা হয়। পূজা কার্যক্রমে কোনো ভুলত্রুটি হলে ক্ষমা প্রার্থনা এবং দেব-দেবীর কাছে আমাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য আত্মসমর্পণ করা হয়। দেব-দেবীর পূজা করার জন্য এ বিধিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫. **আরতি প্রদান ও বিসর্জন:** এ বিধি অনুসারে অভীষ্ট দেব-দেবীর উদ্দেশে আরতি প্রদান করা হয়। আরতির সময় অভীষ্ট দেব-দেবীর কাছে আমাদের ভিতর ও বাইরের সকল খারাপ দিকসমূহ দূর করে দেয়ার জন্য কর্পূর প্রজ্বলিত

করে প্রার্থনা করা হয় এবং সকল পূজারিকে আশীর্বাদ প্রদান করা হয়। এ বিধির মাধ্যমে অভিষ্ট দেব–দেবীর ওপর আমাদের গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে অভীষ্ট দেব-দেবীর প্রতিমাকে বিসর্জন দেয়া হয়।

এ ছাড়াও পূজার সংকল্প গ্রহণ, একটু একটু করে জল পান করার জন্য জল সমর্পণ, দেব-দেবীকে অলংকার সমর্পণ, ছাতা সমর্পণ, পাখা (চামর) বিসর্জন প্রভৃতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

উপচারের ভিত্তিতে পূজার প্রকারভেদ : সাকাররূপে দেব-দেবীর পূজা বিভিন্ন উপচার অনুসারে বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে ।

পঞ্চোপচার পূজা : উপচার শব্দের অর্থ উপকরণ। পঞ্চোপচার পূজা পাঁচটি উপকরণের মাধ্যমে করা হয়। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এ পাঁচটি পঞ্চোপচার পূজার উপকরণ।

দশোপচার পূজা: দশোপচার পূজা দশটি উপকরণের মাধ্যমে করা হয়। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য–এ দশটি দশোপচার পূজার উপকরণ।

ষোড়শোপচার পূজা: আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দনা– এ ষোলটি উপকরণ দিয়ে ষোড়শোপচার পূজা করা হয়।

অঞ্চলভেদে পূজাবিধির কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়। তবে সাধারণ ভাবে সকল অঞ্চলের পূজাপদ্ধতি একই রকম।

একক কাজ : পূজার সাধারণবিধিসমূহ লেখ।

পাঠ ৪ ও ৫: শ্রীশ্রী লক্ষ্মীদেবীর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি

লক্ষ্মীদেবীর পরিচিতি

দেবী লক্ষ্মী সম্পদ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবী । তিনি সুন্দরী ও মাধুর্যময়ী দেবী। তিনি পূজারিদের ধন–সম্পদ দান করে থাকেন। তাঁর বাহন পেঁচা।

দেবী লক্ষ্মী শ্রী হিসেবে অভিহিত। কেননা তিনি সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতার প্রতীক। তিনি ভগবান বিষ্ণুর সহধর্মিণী।

দেবী লক্ষ্মী অত্যন্ত সুন্দর এবং দুই হাতবিশিষ্ট। তিনি পদ্মফুলের উপর উপবিষ্ট। দেবী লক্ষ্মীর গায়ের রঙ ধূসর, সাদা, উজ্জ্বল হলুদ ও নীলাভ হয়ে থাকে। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী সৌন্দর্যের দেবী, সম্পদের দেবী। আমাদের পরিবারের উন্নতি নির্ভর করে সম্পদের ওপর। আর এই সম্পদগুলোর মধ্যে রয়েছে ভূমি, পশু, শস্য, জ্ঞান, ধৈর্য, সততা, শুদ্ধতা ইত্যাদি।

লক্ষ্মীপূজা পদ্ধতি : যে কোনো পূজা করতে পূজাবিধি অনুসরণ করতে হয়। লক্ষ্মীপূজার পদ্ধতি হিসেবে শুদ্ধ আসনে বসে আচমন থেকে শুরু করে পঞ্চদেবতার পূজা করতে হয়। অতঃপর লক্ষ্মীর ধ্যান করে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। লক্ষ্মীপূজা পঞ্চোপচার, দশোপচার বা ষোড়শোপচারে করা হয়ে থাকে। পূজার মৌলিক নীতি হিসেবে দেবী শ্রীলক্ষ্মীর ধ্যান, পূজামন্ত্র পাঠ, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, ও প্রণামমন্ত্র পাঠ করতে হয়। অবশেষে বিসর্জন দিতে হয়।

লক্ষ্মীপূজার সময়কাল : সাধারণত প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা করা হয়। লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠ করা হয়। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমাতিথিতে বিশেষভাবে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। এ লক্ষ্মীপূজা কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা নামে পরিচিত।

একক কাজ : লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী, এ দেবীর পূজাপদ্ধতি তোমার নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণনা কর।

পাঠ ৬ ও ৭ : লক্ষ্মীদেবীর পুষ্পাঞ্জলি, প্রণামমন্ত্র এবং লক্ষ্মীপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

লক্ষ্মীদেবীর পুষ্পাঞ্জলি

ওঁ নমস্তে সর্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্তৎ প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চনাৎ।

সরলার্থ : হে হরিপ্রিয়া, তুমি সকলকে বর দিয়ে থাক। তোমার আশ্রিতদের যে গতি হয়, তোমার অর্চনার দ্বারা আমারও যেন তা হয়। তোমাকে নমস্কার।

লক্ষ্মীদেবীর প্রণামমন্ত্র

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোহস্তুতে।

সরলার্থ : হে দেবী কল্যাণী, বিশ্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর স্ত্রী, তুমি পদ্মা ও পদ্মার আলয়। সকলকে শুভফল দাও। তুমি আমাকে সকলক্ষেত্রে রক্ষা করো। আমি তোমাকে প্রণাম করি।

লক্ষ্মীপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

প্রতিটি হিন্দু পরিবারে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে এবং আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে লক্ষ্মীপূজা করা হয়, যা হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একাত্মতাবোধের সৃষ্টি করে। লক্ষ্মীদেবী ধন-সম্পদ দান করেন। পূজার মধ্য দিয়ে লক্ষ্মীদেবীর উপর বিশ্বাস স্থাপিত হয়। লক্ষ্মীদেবীর শান্ত স্বভাব পূজারিকেও শান্ত করে তোলে।

দলীয় কাজ : লক্ষ্মীপূজার আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব চিহ্নিত কর।

পাঠ ৮ : বিশ্বকর্মা দেবের পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি

বিশ্বকর্মা দেবের পরিচয় : হিন্দুধর্ম অনুসারে বিশ্বকর্মা শিল্পী ও ভাস্কর্য এবং যন্ত্র ও যন্ত্রকৌশলের দেবতা। এ মহাবিশ্বের প্রধান স্থপতি। শিল্পনৈপুণ্য, স্থাপত্যশিল্প এবং কারুকার্য সৃষ্টিতে অনন্য গুণশালী দেবতা তিনি। পুরাণ অনুসারে তিনি দেবশিল্পী। তিনি স্থাপত্য বেদ নামে একটি উপবেদের রচয়িতা। বিশ্বকর্মা দেবের চতুর্ভুজ রূপ অত্যন্ত শৌর্যশালী। তাঁর বাম দিকের এক হাতে ধনুক

আর অন্য হাতে তুলাদণ্ড এবং ডান দিকের এক হাতে হাতুড়ি অন্য হাতে ব্রহ্ম কুঠার। তাঁর বাহন হস্তী। তাঁর কৃপায় মানুষ শিল্পকলা ও যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। তিনি অলংকার শিল্পের স্রষ্টা এবং দেবতাদের বিমান ও অস্ত্রনির্মাতা। তিনি ব্রহ্মার নির্দেশে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী, যম ও বরুণদেবের প্রাসাদ, পুষ্পরথ, ইন্দ্রের বজ্র, শিবের ত্রিশূল, ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, কুবেরের অস্ত্র ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তিনি দ্বারকাপুরীও নির্মাণ করেছেন।

বিশ্বকর্মা পূজাপদ্ধতি

সর্বপ্রকার কারুকার্য বিশ্বকর্মা দেবের সৃষ্টি। বিশ্বকর্মা মানুষকে শৈল্পিক জ্ঞান ও মেধা দান করেন। বিশ্বকর্মা পূজার মূল উদ্দেশ্য তাঁর কৃপা এবং কর্মে শিল্পনৈপুণ্য লাভ করা। কারুশিল্প ও শিল্পশ্রমিকেরা ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি তিথিতে বিশ্বকর্মার পূজা করে থাকেন। পূজার রীতিনীতি অন্যান্য পূজার অনুরূপ হলেও পূজার সময় পারিবারিক সদস্যগণ যেসকল পেশায় নিয়োজিত সেসব পেশায় ব্যবহৃত উপকরণসমূহ বিশ্বকর্মা প্রতিমার কাছে রাখা হয়। বিশ্বকর্মা পূজা পঞ্চোপচারে, দশোপচারে বা ষোড়শোপচারে করা যেতে পারে।

একক কাজ : বিশ্বকর্মা দেবের পরিচয় দাও।

পাঠ ৯ ও ১০ : বিশ্বকর্মা পূজার পুষ্পাঞ্জলি, প্রণামমন্ত্র এবং বিশ্বকর্মা পূজার শিক্ষা ও এর প্রভাব।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

এষ সচন্দন দূর্বাপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ
ওঁ শিল্পবতে শ্রীবিশ্বকর্মণে নমঃ।

সরলার্থ: চন্দন, দূর্বা, পুষ্প ও বিল্বপত্র দিয়ে শিল্পদেবতা বিশ্বকর্মাকে এ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করছি এবং প্রণাম জানাচ্ছি।

প্রণামমন্ত্র

ওঁ দেবশিল্পিন্ মহাভাগ দেবানাং কার্যসাধক।
বিশ্বকর্মন্নমস্তুভ্যং সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদঃ।

সরলার্থ: হে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা, আপনি মহান, দেবগণের কার্যসম্পাদক, সর্ব অভীষ্ট পূরণকারী। তোমাকে প্রণাম।

বিশ্বকর্মা দেবের পূজার শিক্ষা ও প্রভাব

- বিশ্বকর্মার কৃপায় শিল্প ও বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করা যায়। তাঁর আশীর্বাদে কারুশিল্পকর্মে দক্ষতা অর্জন করা যায়। পারিবারিক ও মন্দিরভিত্তিক এ পূজা করার মাধ্যমে বিশ্বকর্মা দেবের প্রতি পূজারিদের ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বকর্মা পূজার মধ্য দিয়ে শিল্পের বিকাশ ঘটানোর প্রেরণা পাওয়া যায় এবং সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে।
- পূজারিগণ স্ব স্ব কাজে মনোযোগী হয় এবং কার্যসম্পাদনে শৈল্পিক মনোভাবে গড়ে ওঠে।
- বিশ্বকর্মার কৃপায় পূজারিগণ শিল্পকলা ও যান্ত্রিক বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করতে পারে।
- বিশ্বকর্মা পূজার মধ্য দিয়ে লোকশিল্পের বিকাশ ঘটে।

দলীয় কাজ : বিশ্বকর্মা দেবের পূজা করার কয়েকটি কারণ উল্লেখ কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. পূজামন্ত্র পাঠ পূজা করার একটি .... দিক।

২. যে কোনো পূজার আগে .... পূজা করতে হয়।

৩. স্বস্তিবাচন বলতে..................... বোঝানো হয়।

৪. সর্বপ্রকার কারুকার্য .... দেবের সৃষ্টি।

৫. স্থাপত্যবেদ নামে একটি উপবেদের রচয়িতা ....।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পূজা করতে পূজাবিধি	লক্ষ্মীপূজা করা হয়
২. ধূপ সৌরভ সৃষ্টি করে	অত্যন্ত শৌর্যশালী
৩. প্রতি বৃহস্পতিবার	শিল্পের বিকাশ ঘটে
৪. বিশ্বকর্মা দেবের চতুর্ভুজ রূপ	মনের পবিত্রতা আনয়ন করে
	অনুসরণ করতে হয়

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. পূজার সময় কীভাবে আসন শুদ্ধি ও আচমন করা হয় ?

২. 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মী সম্পদ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবী'—ব্যাখ্যা কর।

৩. শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর পূজার আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব চিহ্নিত কর।

৪. বিশ্বকর্মা দেবের পূজা কীভাবে করা হয় ?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. 'পূজা-পার্বণে পূজাবিধিগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম'— বিশ্লেষণ কর।

২. পারিবারিক ও সমাজজীবনে লক্ষ্মীপূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

৩. 'শিল্পনৈপুণ্য সৃষ্টিতে অনন্য গুণশালী দেবতা বিশ্বকর্মা'— বিশ্লেষণ কর।

৪. পারিবারিক ও সমাজজীবনে বিশ্বকর্মা দেবের পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পূজার উপচার হিসেবে কোনটি শক্তির প্রতীক ?

ক. ধূপ　　খ. পুষ্প

গ. প্রদীপ　　ঘ. নৈবেদ্য

২. পূজায় আচমনের সাথে কোন দেবতাকে স্মরণ করতে হয় ?

ক. শিব খ. বিষ্ণু

গ. ব্রহ্মা ঘ. অগ্নি

৩. দেব-দেবীর পূজায় আত্মসমর্পণ বিধিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে আমরা –

i. প্রত্যাশা পূরণ করি

ii. ভক্তির প্রকাশ ঘটাই

iii. ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রতীতিদের বাড়িতে প্রতিবছর আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতিথিতে বিশেষ পূজা করা হয়। প্রতীতিও তার মায়ের সাথে উপবাস থেকে এ পূজা করে। এ উপলক্ষে তাদের বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের সমাগম ঘটে এবং এক আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৪. প্রতীতি কোন দেব-দেবীর পূজা করে ?

ক. সরস্বতী খ. লক্ষ্মী

গ. গণেশ ঘ. বিশ্বকর্মা

৫. প্রতীতি উক্ত দেব-দেবীর পূজা করে লাভ করবে –

i. শান্তস্বভাব

ii. ধনসম্পদ

iii. শিল্পনৈপুণ্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অবনীবাবু দা, বটি, কাঁচি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি এ পেশায় দক্ষতা অর্জন ও কৃপালাভের আশায় প্রতিবছর পরম ভক্তিতে পঞ্চোপচারে এক বিশেষ দেব-দেবীর পূজা করেন। এ পূজায় তার পেশায় ব্যবহৃত উপকরণসমূহ প্রতিমার কাছে রাখেন। তার উপলব্ধি পেশাগত পারদর্শিতা লাভ এবং কর্মের সুনাম সবই এ পূজায় পরম ভক্তির ফল।

ক. পূজা শব্দের অর্থ কী ?

খ. পূজার একটি বিধি ব্যাখ্যা কর।

গ. অবনীবাবু প্রতিবছর পরম ভক্তিতে কোন দেব-দেবীর পূজা এবং কীভাবে করেন তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অবনীবাবুর ব্যক্তিজীবনে উক্ত পূজার শিক্ষা ও প্রভাব মূল্যায়ন কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা

ধর্মগ্রন্থ তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে। উপাখ্যানের মাধ্যমে সেই শিক্ষার প্রয়োগের দৃষ্টান্তও দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা ধর্মীয় উপাখ্যানের সাথে নৈতিক শিক্ষার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি। সত্যবাদিতা, ক্ষমা, জীবসেবা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ভ্রাতৃপ্রেম ইত্যাদি নৈতিক শিক্ষার ধারণা এবং এ সম্পর্কিত দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান ও তার শিক্ষা সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা সততা, কর্তব্য নিষ্ঠা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা – এ নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা এবং প্রাসঙ্গিক ধর্মীয় উপাখ্যান ও তার শিক্ষা সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- হিন্দুধর্মের আলোকে সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারব
- উপাখ্যানে বর্ণিত ঘটনার শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- সৎ জীবন পরিচালনার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব
- সৎ জীবন প্রণালীর অভ্যাস গঠনে পরিবারের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব
- ব্যক্তি ও সমাজজীবনে সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সৎ জীবন–যাপনে উদ্বুদ্ধ হব

পাঠ ১ : সততা

'সততা' মানব চরিত্রের একটি বিশেষ মহৎগুণ। 'সৎ' শব্দ থেকে 'সততা' শব্দের উৎপত্তি। এ গুণ যাঁর থাকে তিনি সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে থাকেন। 'সততা' আসলে কোন একক গুণ নয়। কতকগুলো গুণের সমষ্টি মাত্র। এসব গুণের মধ্যে আছে সত্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতা, স্পষ্টবাদিতা, সদাচার, লোভ হীনতা প্রভৃতি। কোন অন্যায় বা অবৈধ কাজ না করার নামই 'সততা'। যিনি সত্যের পূজারী, সত্য কথা বলেন, সৎ পথে চলেন, কখনো সত্যকে গোপন করেন না, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেন না তিনি 'সততা' গুণে গুণান্বিত। সততা ধর্মের অঙ্গ। সততাই মানুষকে অন্য মানুষের নিকট বিশ্বস্ত করে তুলে। সততার গুণেই মানুষ সমাজে

মহান বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। সততাই মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে তার সফলতার দ্বারপ্রান্তে। সততা মানব জীবনে শান্তি ও স্বস্তি এনে জীবনকে করে তোলে আলোকিত ও মহিমান্বিত। যে সকল গুণ মানুষকে মহৎ, পুণ্যবান ও আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তাদের মধ্যে সততার গুরুত্ব সর্বাধিক। সততা মানুষকে নিয়ে যায় মর্যাদার পথে, গৌরবময় স্থানে। সততা মানব চরিত্রের অলঙ্কার। সততার বিপরীত অসততা। অসৎ ব্যক্তি কখনো সমাজের মঙ্গল সাধন করতে পারেনা। কারণ তার মন কালিমা লিপ্ত। সে অন্ধকার জগতের বাসিন্দা। সে সমাজে হিংসা-দ্বেষ ছড়িয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে থাকে। যার ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি বিঘ্নিত হয়। এ ধরণের মানুষকে সকলেই ঘৃণা করে।

একক কাজ : সততা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী ?

পরবর্তী পাঠে আমরা সততা সম্পর্কে একটি উপাখ্যান বর্ণনা করব।

পাঠ ২ : উপাখ্যান - সততার পুরস্কার

ছেলেটির নাম তূণীর। গ্রামের এক দরিদ্র মাতা পিতার একমাত্র সন্তান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পিতা মাতাকে হারিয়ে সে অনাথ হয়ে পড়ে। অর্থাভাবে পড়ালেখা তেমন করতে পারেনি। গ্রামে কাজ কর্মের খুবই অভাব। তাই একদিন সে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে কাজের সন্ধানে। শহরে এসে হাঁটতে হাঁটতে একটি দোকানে এসে দোকানদারকে বলল, "কাকু, আমি খুব তৃষ্ণার্ত। আমাকে এক গ্লাস জল দেবেন?"

দোকানদারের নাম দয়াল বসাক। তিনি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখানে বস, তোমার নাম কী? কোথায় থাক?" দোকানদারের কথায় সে বসল এবং বলল, "আমার নাম তূণীর। অনেক দূরের গ্রাম থেকে এসেছি কাজের সন্ধানে।" দোকানদার তাকে এক গ্লাস জল দিয়ে আলাপচারিতা সেরে কী যেন ভেবে হঠাৎ বললেন, "তুমি এখানে একটু বসে থাক। আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।" তূণীরকে দোকানে বসিয়ে দোকানদার বেরিয়ে গেল। তূণীর দোকানে বসে দোকান পাহাড়া দিতে লাগল। কিন্তু অনেক সময় হয়ে গেল দোকানদার ফিরে আসছেনা। এখন সে কী করবে? দোকান ফেলে কোথাও যেতেও পারেনা। এরই মধ্যে কয়েকজন ক্রেতাও এসেছে শাড়ী কিনতে। শাড়ীর গায়ে দাম লেখা ছিল। তাই শাড়ী বিক্রি করতে তূণীরের কোন অসুবিধা হল না। কারণ বাবার সাথে তূণীর ছোট বেলায় হাটে বাজারে কাপড় বেচা কেনা করেছে। সারাদিনে সে বেশ কয়েকটি কাপড় বিক্রি করল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেল। কিন্তু দোকানদারের দেখা নেই। উপায়ান্তর না দেখে তূণীর দোকান বন্ধ করে সেখানে রাত কাটাল।

দলগত কাজ : তূণীর দোকান ত্যাগ করে চলে গেল না কেন ?

পরের দিনও দোকানদার এলেন না। তূণীর আর কী করে? সে দোকান খুলে বসে রইল। সারাদিন দোকানে সে কাপড় বিক্রি করে কাটাল। দোকানদার সেদিনও ফিরে এলেন না। এভাবে দিন যায়, মাস যায়। কিন্তু দোকানদার আর ফিরে এলেন না। উপায়ন্ত না দেখে তূণীর দোকান চালাতে লাগল। আর দোকানদারের জন্য অপেক্ষায় রইল। ব্যবসায়ী মহলে তার যথেষ্ট নামডাকও হয়েছে। সকলেই তাকে

সম্মান করে। তার চারটি দোকান, অনেক কর্মচারী কাজ করে। সে দোকানগুলোর দেখাশুনা করে। কর্মচারীদের বেতন দেয়, দোকানের হিসেব পত্র দেখে। সে এখন খুবই ব্যস্ত।

একদিন তূণীর দোকানের গদিতে বসে আছে। এমন সময় দেখে এক বৃদ্ধ লোক লাঠিতে ভর করে তার দোকানের সামনে এসে তূণীরকে খুঁজছে। তার পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়। শরীর খুবই দুর্বল ও রুগ্ন। দেখে তাকে ভিক্ষুক বলেই মনে হয়। কিন্তু তূণীর তার দিকে তাকিয়ে তাকে চিনতে পারল। সে তাড়াতাড়ি গদি থেকে নেমে তার কাছে গেল। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কাকু, আমাকে চিনতে পরেননি? আমি তূণীর। আমি এতদিন ধরে আপনার দোকান পাহাড়া দিয়ে আসছি। দোকান ছেড়ে কোথাও যাইনি। দোকানের আয় দিয়ে আরও ব্যবসা বাড়িয়েছি। আপনার কোন ক্ষতি হতে দেইনি। আপনি এসেছেন তাই এবার আমার ছুটি। আপনি আপনার দোকান বুঝে নিন।" বৃদ্ধ দোকানদার তূণীরের সততায় মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। তিনি বললেন, "না তূণীর, আমার আর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। এ সবই তোমার। আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন তুমি ছাড়া এ জগতে আমার কেউ নেই।"

তিনি বললেন, "সেদিন তোমাকে দোকানে রেখে বাইরে গিয়ে সংবাদ পেলাম আমার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। তাই দ্রুত বাড়ি চলে যাই। গিয়ে দেখি আমার স্ত্রী মারা গিয়েছে। তার কয়েকদিন পর ছেলে মেয়ে দু'টোও মারা যায়। তারপর সংসারের ঝামেলার মধ্যে আর থাকতে ইচ্ছে করল না। আশ্রমে আশ্রমে থাকি, তাই তোমার আর কোন খোঁজ খবরও নিতে পারিনি। কিছু হারিয়েও আমি ঈশ্বরের কৃপায় ভালো আছি। হঠাৎ তোমার নামটা মনে পড়ল, তাই ছুটে এলাম। তোমাকে খুঁজে পাব একথা ভাবিনি। তোমাকে এ অবস্থায় দেখে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে তা বলে বুঝাতে পারব না। তুমি আমার দোকান রক্ষা করেছ, আবার আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছ এবং দোকান আমাকে দিতেও চেয়েছ। এটা কয়জন করে? তুমি মানুষ নও, তুমি দেবতা। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি তুমি আরও অনেক বড় হবে।" তূণীর বলল, "কাকু - আপনি আমার পিতার মত। আপনি আমাকে বিশ্বাস করে দোকান ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন। আমি সে বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছি। এটাই আমার সান্ত্বনা। আমি এর বেশি আর কিছু চাই না।" দয়াল বসাক বললেন, "বাবা তূণীর! তুমি যা করেছ, তা কয়জন করে? সকলেই নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অন্যকে ঠকাতে চায়। আর তুমি আমার সেই ছোট দোকান শুধু রক্ষাই করনি, তার আয় থেকে উন্নতি করে আরো ব্যবসা বাড়িয়েছ। এ সবই তোমার। এটাই তোমার পুরস্কার। তুমিই এর প্রকৃত মালিক।" কিন্তু তূণীর তার গ্রামে ফিরে যেতে চাইলেও দয়াল বসাক আর তাকে ছাড়েননি।

উপাখ্যানের শিক্ষা : জীবনকে সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য সততা একটি উৎকৃষ্ট পথ। সততা না থাকলে মানুষ আর পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সততা মানুষকে ভালমন্দের পার্থক্য চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সৎ মানুষকে সকলেই শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। এ বিশ্বে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা সকলেই সততার ধারক ও বাহক। সততার জন্য তাঁরা নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। সত্য প্রকাশ করাই তাঁদের জীবনের ব্রত।

সৎ-এর বিপরীত হল অসৎ। যিনি অসৎ তিনি সত্যকে গোপন করেন। মিথ্যাকে আশ্রয় করে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে চান। ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায় বিচার করেন না। সাময়িকভাবে তিনি সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও তা কখনো চিরস্থায়ী হয় না। কারণ মিথ্যা ক্ষণস্থায়ী। মানুষ তাকে কখনো ভালোবাসেনা, শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। সকলেই তাকে ঘৃণা করে, এড়িয়ে চলতে চায়। কেউ তাকে বিশ্বাস করে না।

তাই আমরা কখনো অসৎ পথে চলব না, অন্যায় কাজ করব না। সকলে সৎপথে চলব, সত্য কথা বলব এবং উপাখ্যানের ভূণীরের মত সততার সাথে সকল কাজ করব। সবসময় মনে রাখব যে, **'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা'**।

একক কাজ : তোমার মতে কেন সততাকে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলা হয়?

পাঠ ৩ : কর্তব্যনিষ্ঠা

আমরা আমাদের পরিবারে ও সমাজে নানা রকমের কাজ করে থাকি। আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষার্থী, তাদের কাজ হবে - ভালো করে লেখাপড়া করা এবং জ্ঞান অর্জন করা। যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের নিজেদের কাজ যত্নের সঙ্গে করতে হয়।

যার যে-কাজের দায়িত্ব, তাকে সে-কাজ করতে হবেই। একেই বলে কর্তব্য। আর কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও গভীর মনোযোগ থাকাকে বলে কর্তব্যনিষ্ঠা। সুতরাং 'কর্তব্যনিষ্ঠা' শব্দটির মানে হলো নিজের করণীয় কাজের প্রতি গভীর মনোযোগ। কর্তব্যনিষ্ঠা একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ।

পড়ালেখা করে জ্ঞান অর্জন করা শিক্ষার্থীর কর্তব্য। আমি শিক্ষার্থী। আমি মন দিয়ে পড়ালেখা করলাম না। তার ফল কী হবে? আমি পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারব না। প্রকৃত জ্ঞানও অর্জন করতে পারব না। তাই কর্তব্য পালন না করলে নিজের ক্ষতি হয়।

সমাজেও মানুষকে নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করতে হয়। সে কর্তব্য পালনে কেউ অবহেলা করলে, তাতে গোটা সমাজেরই ক্ষতি হয়। মোটকথা, কর্তব্যনিষ্ঠা ব্যক্তির চরিত্রকে উন্নত করে, তার মঙ্গল করে এবং এতে সমাজেরও উপকার হয়। কারণ ব্যক্তি নিয়েই তো সমাজ।

মহাভারত থেকে কর্তব্যনিষ্ঠার একটি উপাখ্যান সংক্ষেপে বলছি :

পাঠ ৪ : আরুণির কর্তব্যনিষ্ঠা

অনেক অনেক কাল আগের কথা। শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে গিয়ে থাকত। পড়ালেখা শেষ করে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেত। শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহকে নিজেদের বাড়ির মতোই মনে করত। গুরুও শিক্ষার্থীদের নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। এমনি এক শিক্ষার্থী ছিলেন আরুণি। তাঁর গুরু ছিলেন ঋষি ধৌম্য। তখন বর্ষাকাল। বর্ষার জলের তোড়ে মাঠে ঋষি ধৌম্যের একখন্ড জমির আল ভেঙে গিয়েছিল। ঋষি ধৌম্য আরুণিকে বললেন : 'যাও জমিটার আল বেঁধে এসো।' আরুণি মাঠে গেলেন জমির আল বাঁধতে। কিন্তু জলের কী তীব্র বেগ!

কিছুতেই আরুণি আল বাঁধতে পারলেন না। তখন নিজেই শুয়ে পড়ে জলের তোড় ঠেকালেন। এদিকে দিন পেরিয়ে নামল সন্ধ্যা। ঋষি ধৌম্যের অন্য শিক্ষার্থী সব ফিরে এসেছেন। কিন্তু আরুণির দেখা নেই। চিন্তিত ঋষি ধৌম্য। তিনি অপর দুই শিষ্য উপমন্যু আর বেদকে নিয়ে গেলেন সেই জমির কাছে। আরুণির নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতেই আরুণি ওঠে এলেন। জানালেন, তিনি নিজে শুয়ে পড়ে জমির ভেতর জল

ঢোকা বন্ধ করেছেন। আরুণিকে যে কাজ দেওয়া হয়েছিল, আরুণি তা যত্নের সঙ্গে পালন করেছেন। আরুণির কাজের প্রতি এই যে মনোযোগ, এরই নাম কর্তব্যনিষ্ঠা।

ঋষি ধৌম্য খুব খুশি হলেন। আরুণিও তার কর্তব্যনিষ্ঠার গুণে বিখ্যাত হয়ে রইলেন। আমরাও আরুণির মতো হব। অর্জন করব কর্তব্যনিষ্ঠার মতো নৈতিক গুণ।

উপাখ্যানের শিক্ষা

কর্তব্যনিষ্ঠা ব্যক্তির চরিত্রকে মহৎ করে। তার মঙ্গল করে। আরুণির কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁর চরিত্রকে মহৎ করেছে। তিনি কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য গুরুদেবের প্রিয়পাত্র হয়েছেন। সকলের কাছে সম্মানিত হয়েছেন। স্থাপন করেছেন কর্তব্যনিষ্ঠার এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। আমরাও আরুণির মতো কর্তব্যনিষ্ঠ হব।

একক কাজ : উপাখ্যানের আলোকে তোমার গুরুজনের প্রতি যে সকল দায়িত্ব পালন করবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ ৫ : ত্যাগ–তিতিক্ষা

সাধারণত ত্যাগ বলতে কোনো কিছু বর্জন বা পরিহার করা বোঝায়। কিন্তু বিশেষভাবে ত্যাগ বলতে বোঝায় নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া। নিজের সুখ বা লাভের চিন্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। ভোগ বা সুখের ইচ্ছা পরিহার করাকেই ত্যাগ বলে। ত্যাগ মানবচরিত্রের একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। ত্যাগ ধর্মেরও অঙ্গ। ত্যাগী ব্যক্তি সমাজে আদরণীয় হয়। তাঁকে সকলে শ্রদ্ধা করে। ত্যাগ ছাড়া ধর্ম হয় না। ভোগের কোনো শেষ নেই। যতই ভোগ করা যায়, ভোগের লালসা ততই বেড়ে যায়। ভোগের ইচ্ছাই মানুষকে লোভী করে তোলে। আর এই লোভ মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। সমাজে ডেকে আনে হানাহানি, হিংসা ও বিদ্বেষ। ত্যাগ মানুষকে করে মহান, সমাজে এনে দেয় শান্তি। হিন্দুধর্মের গ্রন্থসমূহে তত্ত্ব, তথ্য ও উপাখ্যানে ত্যাগের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে।

তিতিক্ষাও ত্যাগের মতো আরেকটি বিশেষ গুণ। তিতিক্ষা বলতে বোঝায় সহিষ্ণুতা। তিতিক্ষাও ধর্মের অঙ্গ। নৈতিকতা গঠনে তিতিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিতিক্ষা সমাজে শান্তি আনয়ন করে। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে গড়ে তোলে সৌহার্দ্যের মনোভাব। তিতিক্ষা না থাকলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘাত অনিবার্য। সকলে মিলে, পরস্পর পরস্পরের মতের ও চিন্তার প্রতি সহিষ্ণু হয়েই মানুষ সমাজ গঠন করেছে। সহিষ্ণু না হলে সুষ্ঠুভাবে সামাজিক কাজকর্ম করা অসম্ভব। তাই কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা না থাকলে ব্যক্তিজীবনেও উন্নতি করা যায় না। জীবনে সহিষ্ণুতার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ত্যাগের পাশাপাশি সহিষ্ণুতা বা তিতিক্ষার কথা একই সাথে উচ্চারিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ ও তিতিক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিতিক্ষা না থাকলে ত্যাগের ফলও বিনষ্ট হতে পারে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে তিতিক্ষার অনেক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের ত্যাগ-তিতিক্ষার কাহিনী একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পাঠ ৬ ও ৭ : শ্রীরামচন্দ্রের ত্যাগ-তিতিক্ষা

শ্রীরামচন্দ্র রামায়ণের প্রধান চরিত্র। তিনি বিষ্ণুর অবতার। তিনি ত্রেতাযুগে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানুষ হয়েও চরিত্রগুণে দেবতার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র সেই দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন। মহাবীর হয়েও তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল। মহত্ত্ব, উদারতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, প্রভৃতি ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ।

অযোধ্যার রাজা দশরথ। তাঁর তিন রানি। বড় রানি কৌশল্যা, মেঝো রানি কৈকেয়ী, আর ছোট রানি সুমিত্রা। কৌশল্যার পুত্র রাম, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত, আর সুমিত্রার দুই পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

একক কাজ : তোমার জানা একজন ত্যাগী ব্যক্তির নাম এবং তাঁর ত্যাগের একটি দিক উল্লেখ কর।

নিয়মানুসারে পিতার অবর্তমানে বড় ছেলে যুবরাজ হতো। তারপর সে-ই লাভ করত রাজপদ ও ক্ষমতা। রামের ক্ষেত্রেও তাই হওয়াই স্বাভাবিক। রাম তখন পঁচিশ বছরের যুবক। রাজা দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন। রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করবেন। অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। কিন্তু বাধা এল বিমাতা কৈকেয়ীর কাছ থেকে। রাজা দশরথ একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কৈকেয়ীর সেবাযত্নে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। রাজা দশরথ খুশি হয়ে তাকে দুটি বর দিতে চাইলেন। কিন্তু কৈকেয়ী বললেন, 'মহারাজ, আমি এখন কিছুই চাই না। আমি সময় মতো চেয়ে নেব।'

এখন যেন সেই সময় উপস্থিত হলো। কৈকেয়ী মন্থরার পরামর্শ মতো রাজা দশরথের নিকট এমন দু'টি বর প্রার্থনা করলেন, যা রাজা দশরথের জন্য হৃদয়বিদারক। কৈকেয়ী চাইলেন, এক বরে রাম চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে যাবে, আর এক বরে তার পুত্র ভরত রাজা হবে। রাজা দশরথের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কৈকেয়ীর কথায় তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়ে রইলেন। রামকে আনা হলো দশরথের কাছে। দশরথ রামকে সব বৃত্তান্ত বললেন। তিনি পিতার সত্য রক্ষা করতে বনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি রাজ্য ত্যাগ করে, রাজপোশাক পরিত্যাগ করে বল্কল পরিধান করলেন।

রাম সীতার সাথে দেখা করতে গেলেন। সীতা রামের সাথে বনে যেতে চাইলে সীতার কষ্ট হবে ভেবে তাঁকে সঙ্গে নিতে চাইলেন না। কিন্তু সীতা কোনো কথাই শুনলেন না। তিনি যাবেনই রামের সাথে। এদিকে লক্ষ্মণও কারো বাধা না মেনে রামের সাথে বনে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। শেষে রামের সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণ বনে রওনা হলেন। রাম বনে যাওয়ার প্রাক্কালে নিজের ধনরত্ন এমনকি নিজের হাতিটি পর্যন্ত দান করে দিলেন। বনে যাওয়ার সময় সকলে যখন ভেঙে পড়েছে, রাম তখন হাসিমুখে সমস্ত কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি পিতাকে বললেন, মাতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে। নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিতে।

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ পায়ে হেঁটে চলতে চলতে অনেক পথ অতিক্রম করে চিত্রকূট পর্বতে এলেন। রাজার দুলাল সেখানে পর্ণকুটির নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। এখানে রাজভোগ নেই, খাদ্য বনের ফলমূল আর

বন্য মৃগ। ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিল। কিন্তু ত্যাগী রাম ফিরে যাননি। শ্রীরামচন্দ্রের পুরো জীবনটাই ত্যাগ–তিতিক্ষার। শ্রীরামচন্দ্রের ত্যাগ–তিতিক্ষা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

উপাখ্যানের শিক্ষা : মহাপুরুষদের ত্যাগ-তিতিক্ষার দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী আমাদের ত্যাগ–তিতিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। ত্যাগ-তিতিক্ষার গুণে মানুষ দেবতার স্তরে উন্নীত হতে পারে। যে সকল নৈতিক গুণ মানুষকে সমাজে আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সেগুলোর মধ্যে ত্যাগ-তিতিক্ষা অন্যতম। ত্যাগ-তিতিক্ষা মানুষকে নিয়ে যায় মর্যাদার পথে, গৌরবময় স্থানে। ত্যাগ-তিতিক্ষা মানবচরিত্রের অন্যতম মহৎ গুণ। ত্যাগী মানুষকে সকলেই ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে।

নতুন শব্দ: সদাচার, সত্যনিষ্ঠা, গুণান্বিত, উপায়ান্তর, মৃত্যুশয্যা, প্রজাবৎসল, তিতিক্ষা, মনোরঞ্জন, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা ।

পাঠ ৮ : সৎ-জীবন পরিচালনার গুরুত্ব

সততা, সত্যবাদিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা, ত্যাগ তিতিক্ষা, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানুষের বিশেষ গুণগুলো যার মধ্যে থাকে তাকেই মানুষ সৎ মানুষ বলে জানি । সৎ মানুষ কখনো কারো ক্ষতি করতে পারে না । সে তার আলোকিত জীবন দিয়ে সকলের মনের অন্ধকার দূর করে ।

সমাজের অশান্তি দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার নিজের জীবন বাজি রেখে কাজ করে থাকে । স্নেহ-দয়া, মায়া-মমতা দ্বারা সকলের মঙ্গল করতে চেষ্টা করে । সমাজ থেকে যাতে অন্যায়-অবিচার দূর হয়, সবল যাতে দুর্বলের উপর অত্যাচার করতে না পারে, সে ব্যাপারে তারা সকলকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করে । সমাজে যখনই সৎ মানুষের আবির্ভাব হয়, তখনই সমাজ হয়ে ওঠে শান্তির আধার, মঙ্গলের মোক্ষধাম । সুতরাং আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, দেশের উন্নতি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য সকলকে সৎ জীবনের অধিকারী হতে হবে । সৎ জীবন যাপনের মাধ্যমে সকলের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ইত্যাদি গড়ে তুলতে হবে । আর এভাবেই শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন সম্ভব হবে ।

সুতরাং বলা যায় সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে সৎ জীবন পরিচালনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

পাঠ ৯ : সৎ-জীবন পরিচালনায় পরিবারের ভূমিকা

মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে সৎ, সুজন বা দুর্জন ইত্যাদি কোন গুণাবলি নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে না । জন্মের পর পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কারণে ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ ঘটে । মানুষ প্রবৃত্তির দাস । মানুষের মনে দু'ধরণের প্রবৃত্তি রয়েছে । সৎ প্রবৃত্তি ও অসৎ প্রবৃত্তি । সৎ প্রবৃত্তির ফলে মানুষ যে কাজ করে তাকে সৎ কাজ বলা হয় আর অসৎ প্রবৃত্তির মানুষ সব সময় অসৎ কাজ করে । সৎ কাজের ফলে ব্যক্তি সৎ মানুষরূপে চিহ্নিত হয় । সকলে তাকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে । আর এসব গুণাবলি অর্জনে পরিবারের ভূমিকাই প্রধান । পরিবারের কর্তাব্যক্তি যদি সদগুণের অধিকারী হন তাহলে অন্যান্য সদস্যরাও সদ্গুণের অধিকারী হয় । যেহেতু পরিবারকে বলা হয় সমাজের প্রথম স্তর । সুতরাং সে স্তরকে সুন্দর, সুদৃঢ় করতে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে ধৈর্য, সংযম, সহনশীলতা, ক্ষমা, সহমর্মিতা

প্রভৃতি গুণাবলি অর্জনের সাথে সাথে হিংসা, দ্বেষ, লোভ, লালসা প্রভৃতি অসৎ আচরণগুলো বর্জন করে সৎ ও ন্যায়ের পথে নিজে চালিত করতে হবে।

একক কাজ : সততা ও সৎ জীবন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? কয়েকজন সৎ মানুষের নাম লিখ?

নতুন শব্দ : আন্তরিকতা, স্পষ্টবাদিতা, সদাচার, সত্যনিষ্ঠা, গুণান্বিত, উপায়ান্তর, মৃত্যুশয্যা, সিংহদরজা, বিসর্জন, প্রজাবৎসল, তিতিক্ষা, কীর্তিত, মনোরঞ্জন, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, দ্বেষ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. তিতিক্ষার অপর নাম ....।
২. ভোগে মানুষের .... বৃদ্ধি পায়।
৩. অপরের কষ্ট দূর করার এক নাম ....।
৪. ত্যাগ মানুষের মনে .... এনে দেয়।
৫. অন্যের প্রতি .... হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বাম পাশ	ডান পাশ
১. নৈতিকতা গঠনে	ত্যাগ হয় না
২. তিতিক্ষা না থাকলে	সর্বদা শ্রদ্ধেয়
৩. ত্যাগী মানুষ	সততার গুরুত্ব অপরিসীম
	নিজেকে সমৃদ্ধশালী করাবার

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. সততা বলতে কী বোঝায় ? সততার দুটি উদাহরণ দাও।
২. লক্ষ্মণ রামসীতার সাথে বনে গেলেন কেন?
৩. কৈকেয়ী রাজা দশরথের কাছে বর দুটি প্রার্থনা করলেন কেন?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. ত্যাগ-তিতিক্ষা কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
২. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ত্যাগ-তিতিক্ষা কীভাবে শান্তি আনতে পারে – ব্যাখ্যা কর।

২০১৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্বয়ং বিষ্ণু কোন যুগে রাম অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন ?

ক. সত্যযুগ খ. দ্বাপরযুগ

গ. ত্রেতাযুগ ঘ. কলিযুগ

২. ত্যাগ ও তিতিক্ষা আদর্শে প্রভাবিত ব্যক্তি সর্বদাই –

i. পরিশ্রমী

ii. সহিষ্ণু

iii. দয়ালু

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১। সৃজনশীল প্রশ্ন

নীলরতন ও মনোরমার বেশ সুখেই সাংসারিক জীবন কাটাচ্ছিল। বেশ কয়েকবছর হলো তাদের কোনো সন্তানাদি হচ্ছে না। ডাক্তার বলেছে তাদের সন্তান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এজন্য তাদের দুজনের মধ্যে একটা হতাশা বিরাজ করছে। বাড়ির কর্মচারী দীননাথ ব্যাপারটি লক্ষ করে। সে দরিদ্র। তার দুটি সন্তান। দীননাথ স্ত্রীকে রাজি করিয়ে তার একটি সন্তানকে মনোরমার কোলে তুলে দেয়। মনোরমা নীলরতনের সংসারে শান্তির আবহ ফিরে আসে।

ক. রামায়নের প্রধান চরিত্র কে?

খ. তিতিক্ষার মাধ্যমে সমাজে কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়- ব্যাখ্যা কর?

গ. দীননাথের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে রামচন্দ্রের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মনোরমা ও নীলরতনের সংসারে সুখের আবহের মূলে রয়েছে দীননাথের ভূমিকা– তোমার পঠিত উপাখ্যানের আলোকে মূল্যায়ন কর।

সপ্তম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

জগতের সকল মানুষ এক রকম নয়। কেউ কেউ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সবসময় নিজের মঙ্গলের কথাই চিন্তা করে। এরা সাধারণ মানুষ। আবার কেউ কেউ আছেন এর বিপরীত। তাঁরা অপরের মঙ্গলের কথাও চিন্তা করেন। নিজের ক্ষতি হলেও অপরের মঙ্গল করেন। কেউ কেউ সংসারের সুখ ত্যাগ করে জগতের মঙ্গল সাধন করেন। এঁরা হলেন মহাপুরুষ বা মহীয়সী নারী। এঁদের জীবনচরিতই আদর্শ জীবনচরিত। এঁদের জীবনী থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়তে পারি। এঁদের পথ অনুসরণ করে আমরাও জগতের মঙ্গল করতে পারি। এ অধ্যায়ে এরূপ ছয়জন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর বর্ণনা করা হলো। এঁরা হলেন – শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদা দেবী, সাধক রামপ্রসাদ এবং প্রভু জগদ্বন্ধু।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরজীবনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনায় প্রীতি, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, জীবপ্রেমসহ বিভিন্ন আদর্শিক দিকের বর্ণনা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে মা সারদা দেবীর জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে সাধক রামপ্রসাদের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবনাদর্শের শিক্ষা নিজ জীবনাচরণে মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১, ২ ও ৩ : শ্রীকৃষ্ণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শৈশবেই অসুরদের হাত থেকে গোকুলের শিশুদের রক্ষা করেছেন। মথুরার অত্যাচারী রাজা কংস তাঁকে হত্যা করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেননি। তাঁর হাত থেকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বাঁচিয়েছেন, গোকুলের অন্য শিশুদেরও বাঁচিয়েছেন। এতে কংস আরো হিংস্র হয়ে ওঠেন। তিনি গোকুলের লোকদের ওপর অত্যাচার আরো বাড়িয়ে দেন। তাই একদিন গোপেরা যুক্তি করে গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে যান। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও সঙ্গে যান। সেখানে কৃষ্ণ হন গোপবালকদের দলপতি।

কিন্তু গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে গেলে কী হবে? কংস কৃষ্ণকে মারবেনই। তাই তিনি একের পর এক অনুচর পাঠিয়েছেন বৃন্দাবনে। কৃষ্ণকে মারার জন্য। অনুচরেরা বিভিন্ন ছদ্মবেশে বৃন্দাবনে গেছে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্য জ্ঞানবলে তা জানতে পেরে সবাইকে হত্যা করেছেন। ফলে তিনিও রক্ষা পেয়েছেন এবং অন্য গোপবালকেরাও রক্ষা পেয়েছে।

তাঁর বাল্য ও কৈশোরজীবনের কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো –

বৎসাসুর বধ

একদিন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং অন্যান্য গোপবালকেরা গরু চরাচ্ছিলেন। তখন কংসের এক অনুচর বাছুরের রূপ ধরে কৃষ্ণকে মারতে এলো। কেউ যাতে বুঝতে না পারে তাই সে গরু-বাছুরের সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু কৃষ্ণ ঠিকই তাকে চিনতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বৎসাসুরের লেজ ও দু-পা ধরে জোরে এক গাছের ওপর আছড়ে ফেলেন। ফলে বৎসাসুর মারা যায়।

বকাসুর বধ

বৎসাসুর মারা গেলে কংস কৃষ্ণকে মারার জন্য বকাসুরকে পাঠালেন। একদিন গোপবালকেরা যমুনা নদীর তীরে খেলছিল। শ্রীকৃষ্ণও তাদের সঙ্গে ছিলেন। গোপবালকেরা নদীর তীরে প্রকাণ্ড এক বক পাখি দেখতে পেল। কৃষ্ণ তার নিকট যেতেই বকাসুর তাঁকে গ্রাস করতে এগিয়ে এল। কৃষ্ণ তখন তার বিরাট ঠোঁটদুটো ধরে বিদীর্ণ করে ফেললেন। বকাসুর মারা গেল।

অঘাসুর বধ

অঘাসুর হলো পূতনা রাক্ষসীর ভাই। কংস তাকে ডেকে বললেন, 'কৃষ্ণ তোমার বোনকে হত্যা করেছে। তুমি এর প্রতিশোধ নাও।' অঘাসুর সম্মত হয়ে বৃন্দাবনে চলে গেল।

একদিন কৃষ্ণসহ গোপবালকেরা এক বনের ধারে খেলছিল। অঘাসুর আগে থেকেই সেখানে গিয়ে অজগরের রূপ ধরল এবং বিরাট হাঁ করে চুপচাপ পড়ে রইল। গোপবালকেরা বুঝতে পারেনি। তারা মনে করেছে কোনো গিরিগুহা হবে। তাই তারা অজগরের মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু কৃষ্ণ কাছে এসে বুঝতে পারলেন এ গিরিগুহা নয়। অজগররূপী কোনো অসুর। তখন তিনি অজগরের মুখের মধ্যে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালেন যে অজগরের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। ফলে অঘাসুর মারা গেল এবং গোপবালকগণসহ কৃষ্ণ বেঁচে গেলেন।

এভাবে কংস শ্রীকৃষ্ণকে মারার জন্য অরিষ্টাসুর, কেশী দানব ও ব্যোমাসুরকেও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের হাতে সকলেরই মৃত্যু হয়। ফলে গোপবালকেরাসহ তিনিও রক্ষা পান।

একক কাজ : শ্রীকৃষ্ণ কেন বৎসাসুর ও বকাসুরকে বধ করেছিলেন?

এছাড়া ঐ বয়সে শ্রীকৃষ্ণ আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। যেমন – কালীয় দমন, দাবাগ্নি পান, শঙ্খচূড় বধ, গোবর্ধন ধারণ ইত্যাদি।

কালীয় দমন

গরুড়ের ভয়ে কালিন্দী হ্রদে আশ্রয় নিয়েছিল কালীয় নামে এক মহাবিষধর সাপ। তার বিষে হ্রদের জল হয়ে গিয়েছিল বিষাক্ত। যে-কেউ ঐ হ্রদের জল পান করলে তৎক্ষণাৎ মারা যেত।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের সঙ্গে নিয়ে ঐ হ্রদের পাড়ে খেলছিলেন। তখন তৃষ্ণার্ত হয়ে কয়েকজন বালক হ্রদের জল পান করে। এতে তাদের মৃত্যু হয়। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তারা জীবন ফিরে পায়। কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন, নিশ্চয়ই এই হ্রদে বিষধর কোনো সাপ আছে।

তার বিষেই হ্রদের জল বিষাক্ত হয়েছে। তিনি তখন দিব্যজ্ঞানে কালীয় নাগের কথা জানতে পারেন। কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দেন। আর খাদ্য মনে করে কালীয় নাগ এসে কৃষ্ণকে পেঁচিয়ে ধরে। কৃষ্ণও এমনভাবে কালীয়ের গলা চেপে ধরেন যে তার প্রাণ যায় যায়। তখন কালীয় বুঝতে পারে ইনি সাধারণ লোক নন। স্বয়ং ভগবান। তখন সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কৃষ্ণ তখনই তাঁকে হ্রদ থেকে চলে যেতে বললেন। কালীয় তখন তার মূল আশ্রয় রমণক দ্বীপে ফিরে যায়। এরপর থেকে কালিন্দীর জল আবার পানের যোগ্য হয়।

একক কাজ : কালিন্দীর বিষাক্ত জল কীভাবে পানযোগ্য হয়ে ওঠে?

দাবাগ্নি পান

একদিন সকল গোপ মিলে যমুনার তীরে বনভূমিতে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ বনে দাবানল জ্বলে ওঠে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। পালাবার পথ নেই। সবাই বাঁচার জন্য হাহাকার করছে। কৃষ্ণ তখন সকলকে অভয় দেন। তিনি সকলকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান। তারপর ঐশ্বরিক বলে তিনি সেই দাবানল পান করেন। ফলে দাবানল থেকে সকলে রক্ষা পায়।

গোবর্ধন ধারণ

একদিন সকল গোপ মিলে ইন্দ্রপূজার আয়োজন করেছেন। তা দেখে কৃষ্ণ নন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইন্দ্রকে পূজা করছেন কেন, বাবা?' নন্দ বললেন, 'ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা। তিনি বৃষ্টি দেন বলেই তৃণ, তরু-লতা ইত্যাদি জন্মে এবং বৃদ্ধি পায়। তা খেয়ে আমাদের গাভীগুলো হৃষ্টপুষ্ট হয় এবং অনেক দুধ দেয়। তাই আমরা ইন্দ্রপূজা করছি।' কৃষ্ণ বললেন, 'এই গোবর্ধন গিরি তো তৃণ, তরু-লতা ইত্যাদি উৎপাদন করে। তা খেয়ে আমাদের গরুগুলো হৃষ্টপুষ্ট হয়। তাই আসুন আমরা গোবর্ধন গিরির পূজা করি।'

কৃষ্ণ ইতিপূর্বে অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন। অনেক বিপদ থেকে গোপদের রক্ষা করেছেন। তাই তাঁর কথা কেউ উপেক্ষা করতে পারলেন না। তখন সবাই মিলে বিবিধ উপচারে গোবর্ধন গিরির পূজা করলেন।

এদিকে প্রতিবারের মতো এবারও পূজা না পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ক্ষেপে গেলেন। তিনি মেঘসমূহকে আদেশ দিলেন তুমুল বজ্র ও বৃষ্টিপাত ঘটাতে। শুরুহলো বজ্র ও বৃষ্টিপাত। সব ভেসে যেতে লাগল। গোপরা কান্নাকাটি শুরু করে দিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দ্বারা গোবর্ধন গিরিকে শূন্যে তুলে ধরলেন। সকল গোপ তাদের গরু-বাছুর এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে তার নিচে আশ্রয় নিল। তা দেখে ইন্দ্র বুঝতে পারলেন, স্বয়ং বিষ্ণু কৃষ্ণাবতাররূপে জন্ম নিয়ে এ কাজ করছেন। তখন তিনি লজ্জিত হয়ে কৃষ্ণের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তারপর আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। গোবর্ধন গিরি ধারণ করার জন্য কৃষ্ণের এক নাম হয় গিরিধারী।

শিক্ষা : শ্রীকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, ভগবান তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্যই তিনি অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ভগবান হলেও তিনি মানুষের মতোই আচরণ করেন। তাদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করেন। তাদের মঙ্গলের জন্য সম্ভব-অসম্ভব সব কাজই তিনি করে থাকেন। যে-কোনো বিপদ থেকে জীবকে রক্ষা করার জন্য তিনি সামনে এগিয়ে যান।

কৃষ্ণ তাঁর কৈশোরে বৎসরূপী অসুর, অজগররূপী অঘাসুরকে বধ করে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের সাহসী হতে উদ্বুদ্ধ করে। কালীয় দমনের মধ্য দিয়ে বিষাক্ত অপেয় জলকে সুপেয় করে তোলার মধ্য দিয়ে জনগণের উপকার করেছেন। আবার কালীয় নাগকে হত্যা না করে ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমার আদর্শও স্থাপন করেছেন। দাবাগ্নি পান ও গোবর্ধন ধারণের মধ্য দিয়ে সমাজের মঙ্গল সাধনের আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। তাই আমরা তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করব এবং আমরাও তাঁর মতো অন্যের মঙ্গল সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

একক কাজ : ক. শ্রীকৃষ্ণের জীবপ্রেমের শিক্ষাগুলো চিহ্নিত কর।
খ. ন্যায় প্রতিষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা ঘটনার আলোকে মূল্যায়ন কর।
দলীয় কাজ : ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার প্রয়োগক্ষেত্র চিহ্নিত কর।

পাঠ ৪, ৫ ও ৬ : শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচীদেবী। জগন্নাথ মিশ্রের পৈতৃক নিবাস ছিল বাংলাদেশের শ্রীহট্টের (বর্তমান সিলেট) ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে। বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি নবদ্বীপ গিয়েছিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিয়ে করে তিনি সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

জগন্নাথ মিশ্রের দুই ছেলে – বিশ্বরূপ ও নিমাই। এই নিমাই-ই পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য বা চৈতন্যদেব নামে খ্যাত হন।

নিমাইয়ের অগ্রজ বিশ্বরূপ যৌবনে ঘর ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নিমাইয়ের বয়স যখন দশ-এগার, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। মা শচীদেবী কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে খুব বিপদে পড়েন। বালক নিমাই ছিলেন খুবই চঞ্চল ও দুরন্ত। তবে খুব মেধাবী। শচীদেবী তাঁকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে ভর্তি করিয়ে দেন। তাঁর মেধা এবং রূপের কারণে সকলেই তাঁকে স্নেহ করতেন। গুরু গঙ্গাদাস এমন একজন ছাত্র পেয়ে খুবই খুশি। নিমাই স্বভাবে চঞ্চল ও দুরন্ত হলে কী হবে? পড়াশুনার বেলায় ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবান। তাই অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, অলংকার, স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ষোল বছর বয়সেই তিনি 'পণ্ডিত নিমাই' বলে সারাদেশে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এ-সময় তিনি একটি টোল খুলে ছাত্র পড়াতে লাগলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পুত্রের এই খ্যাতিতে মা শচীদেবী খুবই খুশি। তাঁর মনে আনন্দের ধারা বইতে লাগল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ছেলের বিয়ে দেবেন। কনেও ঠিক

হয়ে গেল। পণ্ডিত বল্লভচার্যের সুলক্ষণা কন্যা লক্ষ্মীদেবী। শচীদেবী তখন একটি অসাধারণ কাজ করলেন। তখনকার নিয়মানুযায়ী তিনি ছেলের বিয়েতে অনেক পণ নিতে পারতেন। কিন্তু পণপ্রথার এই বিষবৃক্ষের মূলে তিনি কুঠারাঘাত করলেন। বিনা পণে তিনি ছেলের বিয়ে দিলেন।

একক কাজ : শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যজীবন সম্পর্কে লেখ।

নিমাই যে কতবড় পণ্ডিত ছিলেন, তা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। সে-সময় কাশ্মীরে এক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন কেশব মিশ্র। তিনি কাশী, কাঞ্চী, নালন্দা প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতদের শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করে একদিন নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হন। তিনি সগর্বে পণ্ডিতদের প্রতি ঘোষণা করেন, 'হয় তর্ক বিচার করুন, না হয় জয়পত্র লিখে দিন।' তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা সবাই জানতেন। তাই নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ ভীত হয়ে পড়েন। তখন তরুণ পণ্ডিত নিমাই বিনয়ের সঙ্গে এগিয়ে আসেন। গঙ্গাতীরে দুজনের মধ্যে কুশল বিনিময় হয়। নিমাইয়ের অনুরোধে কেশব পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে শতাধিক শ্লোকে গঙ্গাস্তোত্র রচনা করেন। এরপর নিমাই শুরু করেন তার সমালোচনা। তিনি কোন শ্লোকে কোথায় কী ভুল আছে তা ব্যাখ্যা করেন। নিমাইয়ের সমালোচনা শুনে উপস্থিত পণ্ডিতগণ বিস্মিত হয়ে যান। কেশব মিশ্রও তাঁর ভুল স্বীকার করেন। এ ঘটনার পর নবদ্বীপে নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আরো বেড়ে যায়।

নিমাই একবার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে আসেন। নবদ্বীপে ফিরে গিয়ে শোনেন সর্পাঘাতে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হয়েছে। এতে তিনি খুব আঘাত পান। সংসারের প্রতি তাঁর মন উঠে যায়। ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে ধর্মানুরাগ প্রবল হয়ে ওঠে। এ বিষয়টি বুঝতে পেরে মা শচীদেবী সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর আবার বিয়ে দেন।

কয়েক বছর সুখেই কাটে। তারপর একদিন নিমাই যান কাশীধামে। পরলোকগত পিতার আত্মার সদগতি কামনায় পিণ্ড দানের জন্য। সেখানে তিনি ঈশ্বরপুরীর নিকট কৃষ্ণনামে দীক্ষা নেন। এতে তাঁর মনে বিরাট পরিবর্তন আসে। নবদ্বীপে ফিরে অধ্যাপনা, সংসারধর্ম সব ছেড়ে দেন। শুধু কৃষ্ণনাম করেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ। এঁরা তাঁর প্রধান পার্ষদ। তবে নিত্যানন্দ ছিলেন সবচেয়ে কাছের।

অনুসারীদের নিয়ে নিমাই বাড়ি-বাড়ি গিয়ে, এমনকি গ্রামের পথে পথে কৃষ্ণনাম প্রচার করতে থাকেন। এতে অবশ্য অনেকে ক্ষুব্ধ হন। অনেকে বাধাও দেন। জগাই-মাধাই নামে মাতাল দুই ভাই একদিন নিমাই ও নিত্যানন্দকে আক্রমণ করেন। কিন্তু নিমাই প্রেমভক্তি দিয়ে সবাইকে আপন করে নেন। তাঁরা সকলে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নিমাইয়ের এ প্রেমভক্তির ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন।

এদিকে সংসারের প্রতি নিমাইয়ের মন একেবারেই উঠে যায়। তিনি সংসার ত্যাগ করার কথা ভাবেন। তারপর মাঘমাসের শুক্লপক্ষের এক গভীর রাতে তিনি মা, স্ত্রী এবং ভক্তদের ছেড়ে গৃহত্যাগ করেন। কাটোয়ায় গিয়ে তিনি কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নতুন নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য।

শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রেমভক্তির ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ান। পুরী, দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি স্থান ঘুরে তিনি জীবনের শেষ আঠার বছর পুরীর নীলাচলে অতিবাহিত করেন। এ-সময় শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট প্রমুখ বিশিষ্ট বৈষ্ণব পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

নীলাচলে অবস্থানকালে শ্রীচৈতন্য প্রায়শই কৃষ্ণনামে উন্মাদ হয়ে থাকতেন। এমনি উন্মাদ অবস্থায় ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে একদিন তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন। হঠাৎ মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সবাই বাইরে উন্মুখ হয়ে বসে থাকেন। তারপর দরজা খুলে তাঁকে আর দেখা যায় না। ভেতরে শুধু জগন্নাথদেবের মূর্তি। ভক্তদের ধারণা, শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদেবের দেহে বিলীন হয়ে গেছেন।

হিন্দুসমাজে তখন বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। শূদ্র ও চণ্ডালদের সবাই ঘৃণা করত। কিন্তু শ্রীচৈতন্য কোনো ভেদাভেদ মানেননি। তাঁর প্রেমভক্তির ধর্মে উচ্চ-নীচ, বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতার কোনো স্থান ছিল না। তিনি আচণ্ডালে স্নেহ বিতরণ করেছেন এবং সবাইকে বুকে স্থান দিয়েছেন। নিজে ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও চণ্ডালদের সঙ্গে এক সারিতে বসে আহার গ্রহণ করেছেন। এর ফলে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ ছিল, হানাহানি ছিল, তা বহুলাংশে দূর হয়েছিল। এভাবে তিনি হিন্দুসমাজকে নানা অবক্ষয় থেকে রক্ষা করেছেন। এটা তাঁর একটা বড় অবদান।

শুধু হিন্দুই নয়, তাঁর প্রেমভক্তির কাছে মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি জাতিভেদও ছিল না। সবাইকে তিনি প্রেম দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন:

যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছাড়।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥

শিক্ষা : শ্রীচৈতন্যের জীবনী থেকে আমরা যে নৈতিক শিক্ষা পাই, তা হলো – পাণ্ডিত্যের অহংকার করা যাবে না। সব সময় বিনয়ী থাকতে হবে। কেউ আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করলে ভালো ব্যবহার দ্বারা তাকে জয় করতে হবে। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ করা চলবে না। সবাইকে কৃষ্ণজ্ঞানে সম্মান দিতে হবে। সমাজের কাউকে ঘৃণা করা যাবে না। মানুষ হিসেবে সবাই সমান। সবাইকে সেইভাবে দেখতে হবে। তবেই সমাজের সবাই সুখী হতে পারবে। সমাজটাও সুন্দর হয়ে উঠবে।

একক কাজ : ক. শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ জীবন থেকে নৈতিক শিক্ষাসমূহ চিহ্নিত কর।
খ. সমাজজীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের নৈতিক শিক্ষার প্রভাব লেখ।
দলীয় কাজ : শ্রীচৈতন্য দেবের শিক্ষা তোমাদের জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে ?

পাঠ ৭, ৮ ও ৯ : সাধক রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ ছিলেন মাতৃসাধক। ব্রহ্মজ্ঞানে তিনি কালীর সাধনা করতেন। কালীই ছিল তাঁর নিকট ঈশ্বর। হরি, ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা – সবই তিনি। তাই রামপ্রসাদ বলেছেন:

কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম
ধর্মাধর্ম সব ভুলেছি।

বাংলা ১১২৭ সনের (১৭২০ খ্রিষ্টাব্দ) আশ্বিন মাসে রামপ্রসাদের জন্ম। পশ্চিমবঙ্গের

গঙ্গাতীরে হালিশহর গ্রামে। পিতা রামরাম সেন এবং মাতা সর্বেশ্বরী দেবী।

রামপ্রসাদ বাল্যকাল থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত, ফার্সি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

ষোল বছর বয়সেই তাঁর মধ্যে অসাধারণ কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটে। কিন্তু সংসারের প্রতি তাঁর মন ছিল না। তাই সংসারমুখী করার জন্য তাঁকে বিয়ে করানো হলো। স্ত্রীর নাম শর্বাণী দেবী।

কিন্তু রামপ্রসাদ সংসারমুখী হলেন না। মাতৃসাধনায় তাঁর মনোযোগ আরো বেড়ে গেল। সংসারের প্রতি তিনি আরো উদাসীন হয়ে পড়লেন। এমন সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। ফলে সংসারের সমস্ত দায় এসে পড়ে তাঁর ওপর। তাই অর্থোপার্জনের জন্য তিনি একদিন কোলকাতা যান।

তখন কোলকাতার গরানহাটের জমিদার ছিলেন দুর্গাচরণ মিত্র। রামপ্রসাদ তাঁর জমিদারিতে মুহুরির পদে যোগদান করেন। তাঁর কাজ হিসেব-নিকেশ রাখা। কিন্তু তাঁর মনে সবসময় মায়ের চিন্তা। তাই হিসাবের খাতায় তিনি মাতৃসঙ্গীত বা শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে চললেন। এ খবর একদিন জমিদারের কানে গেল। তিনি খাতাসহ রামপ্রসাদকে ডাকালেন। রামপ্রসাদ ভয়ে ভয়ে জমিদারের কাছে গেলেন। চাকরি বুঝি আর থাকবে না। কিন্তু হলো তার বিপরীত। জমিদার রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। তিনি বললেন, হিসাব করার জন্য তোমার জন্ম হয়নি। তোমার জন্ম হয়েছে আরো বড় কাজ করার জন্য। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। মায়ের সাধনা করো আর শ্যামাসঙ্গীত রচনা করো। তুমি যে ত্রিশ টাকা বেতন পেতে, তা তুমি নিয়মিত পাবে।

এভাবে জমিদার দুর্গাচরণ রামপ্রসাদের মাতৃভক্তি ও সঙ্গীত রচনার প্রতিভাকে সম্মান দেখালেন। রামপ্রসাদ চলে গেলেন তাঁর গ্রাম হালিশহরে। জমিদারের দেয়া টাকায় তাঁর সংসার কোনোমতে চলতে লাগল। আর একমনে তিনি মায়ের সাধনা আর শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে চললেন।

একক কাজ : জমিদার দুর্গাচরণ রামপ্রসাদকে সম্মান দেখিয়েছিলেন কেন?

রামপ্রসাদ গঙ্গার ঘাটে বসে আপন মনে স্বরচিত শ্যামাসঙ্গীত গাইতেন। তাঁর সুমধুর গান শুনে নৌকার মাঝিদের দাঁড় থেমে যেত। একদিন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা গঙ্গার উপর দিয়ে বজরায় যাচ্ছিলেন। তিনিও বজরা থামিয়ে মন ভরে রামপ্রসাদের গান শোনেন। তাঁর মন অতিশয় তৃপ্ত হয়।

রামপ্রসাদের মাতৃসাধনা ও শ্যামাসঙ্গীতের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও শুনতে পান এ-কথা। একদিন তিনি স্বয়ং চলে আসেন হালিশহরে। রামপ্রসাদকে অনুরোধ করেন রাজকবি হওয়ার জন্য। কিন্তু মাতৃসাধনা ছাড়া তিনি আর কিছুই চান না। তাই মহারাজার প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। মহারাজা রামপ্রসাদের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কিছু নিষ্কর জমি দান করেন। আর তাঁকে অনুরোধ করেন 'বিদ্যাসুন্দর' নামে একটি কাব্য রচনা করতে। ভক্তকবি রামপ্রসাদ শ্যামা মায়ের অনুগ্রহে যথাসময়ে উক্ত কাব্য রচনা করে তুলে দেন মহারাজার হাতে। মহারাজা তাঁর সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরকে কাব্যটি পড়তে দেন। ভারতচন্দ্র কাব্যটি পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী মহারাজা রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

শ্যামা মা ছিলেন রামপ্রসাদের ধ্যান-জ্ঞান। আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে তিনি শুধু মায়ের কথাই চিন্তা করতেন। অন্য কোনো কিছুর প্রতিই তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি হাতে কাজ করতেন, মুখে শ্যামা মায়ের নাম

শুরু করেন। আর অবসর পেলেই বটগাছের নিচে গিয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন। এর ফলে তাঁর পড়াশোনা বেশি দূর এগোয় নি। পাবনা শহর ও শহরতলিতে তাঁর এক তরুণ ভক্তদল গড়ে ওঠে। জগদ্বন্ধুর প্রকৃত নাম ছিল জগৎ। কিন্তু তাঁর ভক্তরা তাঁকে ডাকতেন 'প্রভু জগদ্বন্ধু' বলে। পরবর্তীকালে তিনি এই নামেই পরিচিত হয়ে ওঠেন।

জগদ্বন্ধু একদিন ভক্তদের ছেড়ে তীর্থ ভ্রমণে বের হন। তিনি বিভিন্ন তীর্থ ও গ্রাম-গঞ্জে হরিনাম বিলিয়ে উপস্থিত হন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। সেখানে তাঁর সাধনা চলতে থাকে গভীর থেকে গভীরে। তিনি শ্রীরাধার ভক্ত হয়ে যান। রাধার নাম শুনলেই তিনি ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন।

বৃন্দাবনে কিছুকাল থেকে জগদ্বন্ধু ফিরে আসেন ফরিদপুরে। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মণকান্দায় আসন পাতেন। তখন ফরিদপুরের উপকণ্ঠে ছিল সাঁওতাল, বাগদী ও নমঃশূদ্রদের বাস। সমাজপতিদের দৃষ্টিতে তারা ছিল ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য। এদের জন্য জগদ্বন্ধুর মন কেঁদে উঠল। তিনি একদিন বাগদীদের সর্দার রজনীকে ডেকে পাঠালেন। রজনী এলে প্রভু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে রজনী ধন্য হলেন। রজনী বললেন, 'আমরা নীচু জাতি। সবাই আমাদের ঘৃণা করে আর তুমি আমাকে বুকে টেনে নিলে !' প্রভু তখন বললেন, 'কে বলেছে তোমরা নীচু জাতি? মানুষের মধ্যে কোনো উঁচু-নীচু নেই। সবাই সমান। সবাই ঈশ্বরের সন্তান। তোমরা সবাই শ্রীহরির দাস। তোমাদের পাড়ার সকলে মোহান্ত বংশ। আজ থেকে তোমার নাম হরিদাস মোহান্ত। ভুবন মঙ্গল হরিনাম কর। সকলে ধন্য হও। অচিরেই তোমাদের সকল দুঃখ ঘুচে যাবে।'

প্রভুর কথা আর ব্যবহারে রজনী অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি বাড়ি ফিরে সবাইকে এ-কথা বললেন। সবাই মিলে হরিনামে মেতে উঠলেন। হরিদাস মোহান্ত অল্পদিনের মধ্যেই প্রভুর কৃপায় প্রসিদ্ধ পদকীর্তনীয়া রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। ধীরে ধীরে ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর প্রভৃতি জেলায় হরিনাম কীর্তনের এক অদ্ভুত সাড়া পড়ে গেল। প্রভুর হরিনাম কীর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে মহানাম সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায় গঠনে যাঁর অবদান বেশি, তিনি হলেন প্রভুর অনুরক্ত ভক্ত শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী।

পশ্চিমবঙ্গেও প্রভুর নামের মাহাত্ম্য পরিব্যাপ্ত হলো। সেখানকার নীচু জাতি হিসেবে গণ্য ডোমেরা প্রভুর প্রেরণায় উজ্জীবিত হলো। কোলকাতার ডোমপল্লির বাসিন্দাদের মধ্যে সংকীর্তনের দল গড়ে উঠল। তারা হয়ে উঠল ব্রজজন। মানুষের অধিকার নিয়ে মানুষরূপে মাথা উঁচু করে সমাজে চলার সাহস পেল তারা। সমাজ পরিবর্তনে প্রভু জগদ্বন্ধুর এই অবদান চিরস্মরণীয়।

একক কাজ : সমাজ পরিবর্তনে প্রভু জগদ্বন্ধুর ভূমিকা উল্লেখ কর।

প্রভু একদিন ভক্তদের নিয়ে ভ্রমণে বের হয়েছেন। ফরিদপুর শহরের অনতিদূরে এক জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় এসে তিনি বললেন, 'এখানেই আমি শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা করব।' এরপর তাঁর অনুপ্রেরণায় ঐ স্থানেই শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হলো। এই শ্রীঅঙ্গনেই শুরু হয় প্রভুর গম্ভীরা লীলা। ১৩০৯ সালের (১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ) আষাঢ় থেকে আরম্ভ করে ১৩২৫ সালের (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ) ১৬ ফাল্গুন পর্যন্ত ১৬ বছর ৮ মাস প্রভুর গম্ভীরা লীলা চলে। এ সময় তিনি ছিলেন মৌনী। এর তিন বছর পরে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে প্রভু ইহলীলা সংবরণ করেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু 'শ্রীশ্রীহরিকথা', 'চন্দ্রপাত' ও 'ত্রিকাল' নামে তিনখানা গ্রন্থ এবং বহু কীর্তন রচনা করে গেছেন।

ধর্মচর্চায় যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

বিবেকানন্দ কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। কাজ ছাড়া তিনি কিছুই বুঝতেন না। তাই বিশ্রামের অভাবে অল্পদিনেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। ফলে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুলাই বেলুড় মঠে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শিক্ষা : বিবেকানন্দের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, সততা ও নির্ভীকতা মানুষের দুটি শ্রেষ্ঠ গুণ। এছাড়া কেউ বড় হতে পারে না। পৃথিবীর সকল মানুষ এক জাতি। ধর্ম তাদের পৃথক পৃথক হতে পারে। তবে সব ধর্মেরই ভিত্তি এক এবং তা হলো সত্য। সত্যই ধর্ম। পরোপকার, স্বাধীনতা – এগুলো ধর্মের অঙ্গ। পরাধীনতা ও পরপীড়ন পাপ। মানুষকে ধর্মের কথা বলার আগে তার দারিদ্র্য মোচন করতে হবে। কারণ খালি পেটে কেউ ধর্মের কথা শুনতে চায় না। ধনী-দরিদ্র, মুচি-মেথরে কোনো পার্থক্য নেই। সবাই ভাই-ভাই। কোনো মানুষই অস্পৃশ্য নয়, পেশা তার যা-ই হোক। আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস উন্নতির প্রথম শর্ত। ধর্মচর্চার আগে শরীর সুস্থ ও বলবান রাখতে হবে। কারণ দুর্বল শরীরে শুধু ধর্ম নয়, কোনো কাজই ঠিকমতো করা যায় না।

বিবেকানন্দের এই শিক্ষা আমরা আমাদের জীবনে কাজে লাগাব। তাহলে আমরাও সফল জীবনের অধিকারী হতে পারব।

দলীয় কাজ : স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের শিক্ষাসমূহ চিহ্নিত কর।

পাঠ ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ : প্রভু জগদ্বন্ধু

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রভু জগদ্বন্ধু। তাঁর পিতা দীননাথ চক্রবর্তী, মাতা বামাদেবী। বাবা–মার তৃতীয় সন্তান ছিলেন জগদ্বন্ধু। দীননাথের পিতৃনিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার কোমরপুর গ্রামে। পদ্মার ভাঙানে গ্রামটি বিলীন হয়ে গেলে তাঁরা গোবিন্দপুর গ্রামে এসে বসবাস করেন। দীননাথ ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'ন্যায়রত্ন' উপাধি পেয়েছিলেন। কর্মোপলক্ষে তিনি মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন। সেখানে অতি অল্প বয়সে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। জগদ্বন্ধুর তখন শৈশব অবস্থা। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দীননাথ চলে আসেন স্বগ্রাম গোবিন্দপুরে। তখন জগদ্বন্ধুর লালন-পালনের ভার পড়ে তাঁর জেঠতুত বোন দিগম্বরীর ওপর।

জগদ্বন্ধুর বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। এর কয়েক মাস পর গোবিন্দপুর গ্রামটিও পদ্মার ভাঙানে পড়ে। তখন চক্রবর্তী পরিবার চলে আসে ফরিদপুরের শহরতলি ব্রাহ্মণকান্দায়।

জগদ্বন্ধু ফরিদপুর জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি পাবনা শহরে গিয়ে পড়াশোনা করেন। শহরের উপকণ্ঠে ছিল এক প্রাচীন বটগাছ। তার নিচে থাকতেন এক বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ। মানুষ তাঁকে 'ক্ষ্যাপা বাবা' বলে ডাকত। একদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় জগদ্বন্ধুর। জগদ্বন্ধু তাঁকে বলতেন 'বুড়ো শিব'। সময় পেলেই জগদ্বন্ধু তাঁর কাছে যেতেন। এর ফলে দুজনের মধ্যে ভাব হয়ে যায়। জগদ্বন্ধুর ভেতরে একটা পরিবর্তন আসে। তিনি গৌরাঙ্গ ভাবে ভাবিত হয়ে ভক্তিধর্মের পদ রচনা করতে

ইউরোপের মানুষ হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে নতুন করে জানতে পারেন। অনেকে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে যান। তাঁদের মধ্যে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিবেকানন্দের আদর্শে এতটাই উদ্বুদ্ধ হন যে, নিজের জন্মভূমি আয়ারল্যান্ড ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। বিবেকানন্দের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা।

প্রায় চার বছর পৃথিবী ভ্রমণ করে বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফেরেন। দেশের মানুষ তাঁকে মহাসমাদরে গ্রহণ করে। বিশাল সংবর্ধনা দেয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি দেশের মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে বলেন। সমস্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে বলেন। দেশের সব মানুষকে বিভেদ ভুলে এক হতে বলেন। তিনি বলেন, শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ।

একক কাজ : শিকাগো বিশ্বধর্মসভায় স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ বক্তা হওয়ার কারণগুলো নির্ণয় কর।

বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা ধর্মের অঙ্গ। নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর সকলেই আমাদের ভাই। এদের সেবাই পরম ধর্ম। আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস – এ-দুটি জিনিসই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়। যুবকদের আগে শরীর গঠন করতে হবে। তারপর ধর্ম চর্চা করবে। দুর্বল শরীরে ধর্মচর্চা হয় না। কোনো কাজই হয় না। এজন্য তাদের গীতা পড়ার আগে ফুটবল খেলতে হবে। তাতে শরীর গঠিত হবে। তখন তারা গীতা আরো ভালো বুঝবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো – খালি পেটে ধর্ম হয় না। তাই সবার আগে মানুষের দারিদ্র্য ঘোচাতে হবে। ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। জীবসেবা করলেই ঈশ্বরসেবা হবে। এ ব্যাপারে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে:

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

বিবেকানন্দের কাছে উঁচু-নীচু কোনো ভেদাভেদ ছিল না। অস্পৃশ্যতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামে একটি মঠ স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মঠ। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বেলুড়ে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে এটি অবস্থিত। সাধারণভাবে এটি বেলুড় মঠ নামে পরিচিত। মানবসেবার আদর্শ নিয়ে এ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গুরুদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনও প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা রয়েছে। এসবের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ। বাংলাদেশে যেসব মঠ ও মিশন রয়েছে, সেসবের প্রধান কেন্দ্র ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন। পৃথিবীব্যাপী এই মঠ ও মিশনের মাধ্যমে শত শত মানুষকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, চিকিৎসা, আপৎকালীন সাহায্য প্রদান ইত্যাদি।

বিবেকানন্দের সেবাধর্মে কোনো জাতিভেদ বা ধর্মভেদ ছিল না। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সেবা প্রদান করতেন। একবার কোলকাতায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। সেখানে কয়েকজন মুসলমান বালক এসেছিল থাকার জন্য। এদের কী করা হবে জানতে চাইলে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, মুসলমান বালকেরা অবশ্যই থাকবে। শুধু তা-ই নয়, তাদের খাওয়া-দাওয়া এবং

তাঁর মনে এক পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি কেবল ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করেন। ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়? এ ধরনের প্রশ্ন অহরহই তাঁর মনে জাগে। তিনি অনেককে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেসও করেছেন। কিন্তু সদুত্তর মেলেনি। এমন সময় একদিন তাঁর দেখা হয় সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথ একদিন চলে যান সেখানে। রামকৃষ্ণকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?' রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি; যেমন তোকে দেখছি। চাইলে তোকেও দেখাতে পারি।'

এই সাদাসিধে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের ভালো লাগে। তাঁর প্রতি কেমন যেন একটা ভক্তির ভাব জেগে ওঠে। তাই তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নেন। নরেন্দ্রনাথ হন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তখন তাঁর নাম হয় বিবেকানন্দ। পরবর্তীকালে ভক্তরা তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বা শুধু স্বামীজী বলেই ডাকতেন।

বিবেকানন্দ গৃহত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ এবং তার মানুষকে ত্যাগ করেননি। তাই তিনি বেরিয়ে পড়লেন দেশের পথে পথে। নিজের চোখে দেখতে চাইলেন ভারতবর্ষের মানুষের অবস্থা। তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন। দেখলেন, সারা দেশে কেবল দারিদ্র্য আর দারিদ্র্য। কেবল অশিক্ষা আর কুশিক্ষা। দেশবাসীর এই হীন অবস্থা দেখে তিনি খুব কষ্ট পেলেন। তিনি এই অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর দারিদ্র্যের কারণ জানতে চাইলেন। কীভাবে এসব থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করা যায়, সে-কথাও চিন্তা করতে লাগলেন।

দেশে তখন ইংরেজ শাসন চলছে। পরাধীন দেশ। তিনি বুঝতে পারলেন, পরের শাসনে দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ দেশকে বাঁচাতে হবে, জাগাতে হবে। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। পরাধীন দেশ কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হবে। অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করতে হবে। সব মানুষকে ভালোবাসতে হবে। সবার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই দেশের উন্নতি হবে।

দলীয় কাজ : দেশের উন্নতির জন্য স্বামীজী কী কী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান। সেখানে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার শুরুতে তিনি উপস্থিত সকলকে 'ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলে সম্বোধন করেন। অন্যরা করেছেন প্রথাগতভাবে 'ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ' বলে। কিন্তু বিবেকানন্দের মুখে এই নতুন সম্বোধন শুনে উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হন। অজানা অচেনা লোকদের এভাবে ভাই-বোন বলে আপন করে নেয়ার মানসিকতা দেখে তাঁরা বিস্মিত হন। তারপর বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক – ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।' বিবেকানন্দের এই বক্তৃতায় সবাই অত্যন্ত খুশি হন। ধর্মসভার বিচারে তিনি হন শ্রেষ্ঠ বক্তা। তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বছর আট মাস।

ধর্মসভায় বক্তৃতার পর সারা আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আহ্বান আসে বক্তৃতার জন্য। তিনিও হিন্দু ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা জয় করেন। তারপর যান ইউরোপ। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশ ঘুরে বেড়ান এবং বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতা থেকে

পাঠ ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ : স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন একজন নামকরা উকিল। তিনি একজন পণ্ডিতও ছিলেন। অনেক ভাষা জানতেন। বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন একজন সুগৃহিণী।

বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ছেলেবেলায় তাঁর আরেকটি নাম ছিল – বীরেশ্বর। তবে আদর করে তাঁকে সবাই 'বিলে' বলে ডাকতেন।

বিবেকানন্দের জীবন খুব দীর্ঘ ছিল না। মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ২৩ দিন তিনি বেঁচেছিলেন। এই অল্প সময়ে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির কল্যাণের জন্য তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, তা অসাধারণ। চিরদিন মানুষ তাঁর এই অবদানের কথা স্মরণ করবে।

আগেই বলা হয়েছে, ছেলেবেলায় বিবেকানন্দকে সবাই বিলে বলে ডাকতেন। বিলে ছিলেন খুবই দুরন্ত ও একরোখা। তবে খুব মেধাবী। লেখাপড়ায় খুব ভালো ফল করতেন। পাশাপাশি খেলাধুলা ও গানবাজনায়ও পারদর্শী ছিলেন।

বিলের মধ্যে ছেলেবেলায়ই আরো অনেক গুণের প্রকাশ ঘটেছিল। তিনি যেমন ছিলেন সত্যবাদী, তেমনি ছিলেন নির্ভীক। একটি ঘটনা থেকে তা জানা যায়। একদিন শ্রেণিতে শিক্ষক পড়াচ্ছেন। বিলে তখন কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তা দেখে শিক্ষক রেগে যান। তিনি তাঁদের পড়া জিজ্ঞেস করেন। বিলে ছাড়া আর কেউ পড়া বলতে পারেননি। কারণ বিলে পড়াও শুনছিলেন আর কথাও বলছিলেন। তাই শিক্ষক বিলে বাদে অন্যদের দাঁড়াতে বললেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বিলেও উঠে দাঁড়ালেন। শিক্ষক বললেন, 'তোমাকে দাঁড়াতে হবে না।' উত্তরে বিলে বললেন, 'আমিও তো কথা বলেছি। অপরাধ তো আমিও করেছি।' বিলের এই সততা ও নির্ভীকতায় শিক্ষক খুব খুশি হন। বিলের এই সততা ও নির্ভীকতা তাঁর পরবর্তী জীবনেও আমরা দেখতে পাই।

বিলে সাধু-সন্ন্যাসীদের খুব শ্রদ্ধা করতেন। দরিদ্রদেরও খুব ভালোবাসতেন। তাই তাদের দেখলে দৌড়ে ঘরে যেতেন। ঘরে জামা-কাপড়, খাবার-দাবার যা পেতেন, এনে দিয়ে দিতেন।

একক কাজ : বিলে কীভাবে সততা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিল ?

বিলে যে পরবর্তী জীবনে বীর সন্ন্যাসী হবেন, স্বামী বিবেকানন্দ হবেন, তার আভাস তাঁর ছেলেবেলায়ই পাওয়া গেছে। বিলে ছিলেন তাঁর খেলার সাথীদের দলনেতা। সুযোগ পেলেই তিনি সাথীদের নিয়ে 'ধ্যান-ধ্যান' খেলায় মেতে উঠতেন। কখনো একা-একাই ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। ধ্যান করাটা তাঁর একটা প্রিয় খেলা ছিল।

বিলে বড় হয়েছেন। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় ভালো ফল করেছেন। এখন তাঁকে সবাই আসল নামেই ডাকে। নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ বিএ-ও পাশ করেছেন। আইন ও দর্শন বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান। এ-সময়ে

১২৯৩ সালের ৩১ শ্রাবণ (১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট) শ্রীরামকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন। জীবনসাথীকে হারিয়ে শ্রীমা যেন একেবারে একা হয়ে যান, যদিও তাঁর ভক্ত-সন্তানেরা সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকতেন। মনের শান্তির জন্য কিছুদিন পরে শ্রীমা তীর্থভ্রমণ শুরু করেন। এ উপলক্ষে তিনি কাশী, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করে আসেন। এতে তাঁর মন অনেকটা শান্ত হয়।

সারদা দেবী শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মনটা ছিল খুব উদার। তাঁর মধ্যে কোনো কুসংস্কার ছিল না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভগ্নী নিবেদিতার একটি ঘটনায়। বিবেকানন্দ একদিন নিবেদিতাকে পাঠিয়েছেন সারদা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি গেছেন। তার আগে একজন শিষ্য গিয়ে সারদা দেবীকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি এই মেমসাহেবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন কি-না। উত্তরে সারদা দেবী বললেন, 'নরেন একটি শ্বেতপদ্ম পাঠিয়েছে। তা কি আমি না নিয়ে পারি?' সেকালে কতটা উদার হলে একজন বিদেশিনীকে এভাবে আপন করে নেয়া যায়?

শেষ বয়সে শ্রীমা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিষ্য সারদানন্দকে ডেকে বলেন, 'আমার বোধ হয় যাবার সময় হলো।' এর কিছুদিন পর ১৩২৭ সালের (১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ) ৪ শ্রাবণ মা সারদা নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। বেলুড় মঠে তাঁর দেহের সৎকার করা হয়। পরের বছর সেখানে একটি মাতৃমন্দির নির্মিত হয়।

সারদা দেবীর কয়েকটি উপদেশ

১. পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর ওপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, পৃথিবী অবাধে সব সইছে, মানুষেরও সেই রকম চাই।

২. যদি শান্তি চাও, কারও দোষ দেখ না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ, কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।

৩. সাধন বল, ভজন বল প্রথম বয়সেই করে নেবে। শেষে কি আর হয়? যা করতে পার এখন কর।

শিক্ষা: সারদা দেবীর জীবনী থেকে আমরা প্রথমেই যে নৈতিক শিক্ষাটি পাই, তা হলো ত্যাগ। ত্যাগ না করলে বড় কিছু হওয়া যায় না। সারদা দেবীর ত্যাগের কারণেই গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ হতে পেরেছিলেন। যারা শুধু সংসারে আবদ্ধ থাকে, তারা জগতের জন্য কিছু করতে পারে না। মানুষের মধ্যে সহ্যগুণ থাকতে হবে। মানুষ অসহিষ্ণু হলে সমাজে শান্তি আসবে না। কেবল অন্যের দোষ না দেখে নিজের দোষ দেখতে হবে। তবেই জগৎকে ভালোবাসা যাবে। জগতের সকলকে আপন করা যাবে। সাধন-ভজন প্রথম বয়সেই করতে হবে, কেননা শরীর তখন সুস্থ-সবল থাকে। দুর্বল শরীরে কোনো কাজই হয় না।

সারদা দেবীর এই শিক্ষা আমরা সবসময় মনে রাখব এবং তা পালন করব।

দলীয় কাজ : মা সারদাদেবীর জীবনের ঘটনাপ্রবাহ ও শিক্ষা চিহ্নিত কর।

২০২১

সারদা দেবীদের পরিবার সচ্ছল ছিল না। সামান্য জমি-জমার ফসল এবং পিতা পৌরোহিত্য করে যা অর্জন করতেন, তা দিয়ে কোনোরকমে সংসার চলত।

সেকালে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল, মেয়েরা লেখাপড়া করলে আর সংসারের কাজ করবে না। তাই পিতা রামচন্দ্র সারদা দেবীর লেখাপড়ার প্রতি ছিলেন উদাসীন। কিন্তু সারদা দেবী নিজের উৎসাহে ভাইদের সঙ্গে গ্রামের পাঠশালায় যেতেন। এভাবে তিনি কিছু কিছু পড়তে শিখেছিলেন, কিন্তু লিখতে শেখেননি। তবে কথক ঠাকুরদের কথা, যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতি শুনে শুনে তিনি নানা বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

একক কাজ : সারদা দেবীর বাল্যজীবন সম্পর্কে লেখ।

কামারপুকুর গ্রামের ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র গদাধরের সঙ্গে সারদা দেবীর বিয়ে হয়। এই গদাধরই বিখ্যাত সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

সারদা দেবী স্বামীর সান্নিধ্য খুব একটা পাননি। তাঁদের দাম্পত্যজীবনও দীর্ঘ ছিল না। বিয়ের বছর দেড়েক পরে শ্রীরামকৃষ্ণ চলে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। সারদা দেবী চলে যান পিত্রালয়ে। দুই বছর পর জয়রামবাটীতে তাঁদের আবার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে কিছুদিন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে চলে আসেন। দীর্ঘ সাত বছর পর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মভূমি কামারপুকুর দর্শনে যান। সেখানে সারদা দেবীর সঙ্গে তাঁর পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। এ সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবীকে জীবনের কর্তব্য ও ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক উপদেশ দেন। তিনি বলেন, 'ঈশ্বর সকলেরই অতি আপনার। যে তাঁকে মনে-প্রাণে ভালোবাসে, ডাকে, সে-ই তাঁর দেখা পায়। তুমি যদি ডাক, তুমিও তাঁর দেখা পাবে। তাঁর দেখা পাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য।'

স্বামীর এই উপদেশ সারদা দেবীর অন্তর স্পর্শ করে। তিনি একে মন্ত্ররূপে গ্রহণ করে সাধনার পথে যাত্রা শুরু করেন। অন্য স্ত্রীলোকদের মতো তিনি নিজেকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করেননি। স্বামীকেও ছেড়ে দিয়েছেন সাধনার জগতে।

সাত মাস পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে চলে আসেন। সারদা দেবী চলে যান পিত্রালয়ে।

তারপর দীর্ঘদিন কেটে যায়। স্বামীর চিন্তায় সারদা দেবী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন দক্ষিণেশ্বরে যাবেন। পিতাকে তাঁর মনোভাব জানান। রামচন্দ্র মেয়েকে নিয়ে রওনা হন। সেটা ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কোলকাতার গঙ্গাতীরে গঙ্গাস্নান উৎসব হবে। এই উৎসবকে সামনে রেখেই তাঁরা যাত্রা করেন। অনেক কষ্ট করে পায়ে হেঁটে তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছান।

দক্ষিণেশ্বরে এসে সারদা দেবী স্বামীর সেবা-যত্নে মন-প্রাণ ঢেলে দেন। স্বামীর সাধনায় যাতে কোনোরকম বিঘ্ন না ঘটে, সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন সতত যত্নশীল। তিনি নিজেও স্বামীর উপদেশমতো কঠোর সাধনায় মগ্ন হন। এর ফলে সকলের কাছে তাঁর নতুন পরিচয় হয় 'শ্রীমা' বলে।

দলীয় কাজ : সারদা দেবীর 'শ্রীমা' হয়ে ওঠার কারণগুলো উল্লেখ কর।

সারদা দেবীও তাঁর আচার-আচরণ ও সাধন-ভজনের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে ওঠেন। সকলেই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। তিনিও সকলকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করতেন। এভাবে স্বামী-স্ত্রী মিলে ঈশ্বর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

২০২৫

নিতেন। এই একনিষ্ঠতার কারণে শ্যামা মা-ও তাঁর একান্ত আপনজন হয়ে গিয়েছিলেন। কন্যারূপে তিনি রামপ্রসাদের নিকট ধরা দিয়েছিলেন। ঘটনাটি এরূপ :

একদিন রামপ্রসাদ ঘরের বেড়া বাঁধছিলেন। অপর পাশ থেকে মেয়ে জগদীশ্বরী তাঁকে সাহায্য করছিল। এক সময় বয়সের চাপল্যবশত জগদীশ্বরী খেলতে চলে যায়। তখন মা শ্যামা মেয়ের রূপ ধরে এসে রামপ্রসাদকে কাজে সাহায্য করেন। অনেকক্ষণ পরে জগদীশ্বরী এসে দেখে বাবার বেড়া বাঁধা হয়ে গেছে। সে বাবাকে সব খুলে বলল। তখন রামপ্রসাদ বুঝতে পারলেন শ্যামা মা-ই তার মেয়ের রূপ ধরে এসেছিলেন। রামপ্রসাদ মা–মা বলে ডাকতে লাগলেন। ভক্তিভাবে তাঁর দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রামপ্রসাদের সাধনা চলতে লাগল। গভীর থেকে গভীরে। রাতদিন তিনি শুধু মায়ের চিন্তায়ই মগ্ন থাকেন। তাঁর এই একনিষ্ঠ সাধনায় একদিন মা এসে দেখা দিলেন। চারদিক আলোকিত করে তিনি রামপ্রসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। রামপ্রসাদ মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলেন। তাঁর সাধনা সিদ্ধ হলো। মাতৃরূপে ঈশ্বর সাধনার যে দৃষ্টান্ত রামপ্রসাদ স্থাপন করলেন, তা-ই পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাক্ষেপা প্রমুখ সাধককে এ সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে।

রামপ্রসাদ মাতৃসাধনা করতে গিয়ে যে-সব শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন, তা বাংলা সঙ্গীতজগতে এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর গানগুলো 'রামপ্রসাদী' গান নামে পরিচিত। এর মধ্য দিয়ে যেমন ঈশ্বরসাধনা হয়, তেমনি জন্মদাত্রী মায়ের প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পৃথিবীতে মা হচ্ছেন সন্তানের কাছে সবচেয়ে আপন। এই চিন্তা থেকেই হয়তো রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃজ্ঞানে আরাধনা করেছেন। ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে এই মাতৃসাধক ইহলোক ত্যাগ করেন।

শিক্ষা : রামপ্রসাদের জীবনী থেকে আমরা প্রথমেই যে নৈতিক শিক্ষাটি পাই তা হলো, একনিষ্ঠতা। একনিষ্ঠ থাকলে যে-কোনো কাজে সফল হওয়া যায়। দ্বিতীয়ত ঈশ্বরকে মাতৃরূপে সাধনা করলে জন্মদাত্রী মায়ের প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। তাই একনিষ্ঠতা শুধু ধর্মচর্চার ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সব কাজেই থাকতে হবে। জাগতিক বিষয়ের প্রতি নির্লোভ হয়ে একনিষ্ঠভাবে আমাদের সব কাজ করতে হবে।

দলীয় কাজ : সাধক রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনাবলি এবং এর শিক্ষা চিহ্নিত কর।

পাঠ ১০, ১১ ও ১২ : সারদা দেবী

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে সারদা দেবীর জন্ম। সে দিনটি ছিল বাংলা ১২৬০ সালের (১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) ১৮ পৌষ বৃহস্পতিবার। পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাতা শ্যামাসুন্দরী। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় ঠাকুরমণি দেবী। মা নাম রাখেন ক্ষেমাঙ্করী। স্নেহময়ী মাসি নাম রাখেন সারদা। মাসির রাখা নামেই পরবর্তীকালে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। সারদা দেবী ছিলেন তাঁর মা-বাবার প্রথম সন্তান। তাঁর আরো একটি বোন ও পাঁচটি ভাই ছিল।

জীবের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়। পরোপকারী এবং উপকৃত ব্যক্তির মধ্যে স্থাপিত হয় প্রীতির বন্ধন। তাই ব্যক্তিজীবন ও সমাজের ক্ষেত্রে পরোপকার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

মহাভারতে আছে—একদা একটি রাক্ষস এক গ্রামে এসে খুব অত্যাচার শুরু করল। রাক্ষসটার নাম 'বকরাক্ষস'।

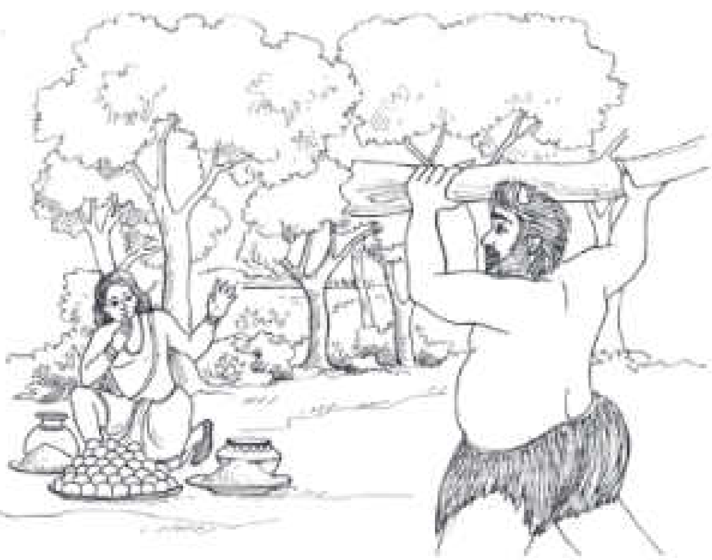

সে প্রতিদিন অনেক মানুষ ও গৃহপালিত পশু আক্রমণ করে মেরে ফেলত। তারপর কিছু খেত, কিছু পড়ে থাকত। গ্রামের মানুষেরা তখন বকরাক্ষসকে অনুরোধ জানাল, 'প্রতিদিন প্রতি বাড়ি থেকে একজন করে মানুষ দেব। এভাবে এত লোক, এত পশু মেরে ফেল না। বকরাক্ষস তাতে রাজি হলো।

একদিন এক পরিবারের পালা এলো। ঐ পরিবার থেকে একজনকে রাক্ষসের খাদ্য হয়ে মরতে হবে।

তখন মা কুন্তীসহ পাণ্ডবেরা পাঁচভাই– যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব– ঐ বাড়িতে ছিলেন। কান্নাকাটি শুনে এগিয়ে গেলেন কুন্তী।

ঐ পরিবার থেকে বকরাক্ষসের খাদ্য হিসেবে যার যাওয়ার কথা ছিল, মা কুন্তীর অনুরোধে পুত্র ভীম তাকে রক্ষা করলেন। বকরাক্ষসকেও মেরে ফেললেন। গ্রামবাসীরাও বিপদ থেকে মুক্ত হলো। ভীমের এ আচরণ পরোপকারের দৃষ্টান্ত।

আমরাও পরোপকারী হবো। তাহলে আমাদের চরিত্র উন্নত হবে। সমাজের অন্যান্য মানুষও উপকৃত হবে।

দলীয় কাজ : পরপোকারের পাঁচটি দৃষ্টান্ত চিহ্নিত করে এর প্রভাব লেখ।

পাঠ ৪ : সেবা

সেবা শব্দটির অর্থ হচ্ছে যত্ন বা শুশ্রূষা। সেবার আর একটি অর্থ পরিচর্যা। পরম মমতায় অপরের পরিচর্যা করাকে সেবা বলে। এটি মানুষের একটি বিশেষ গুণ। সেবা পরম ধর্ম। শাস্ত্রে বলা হয়েছে শিবজ্ঞানে

এই যে, মানুষের মধ্যে ভেদাভেদহীন চেতনা একেই বলে উদারতা। সুতরাং উদারতা একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ। উদারতা ব্যক্তির চরিত্রকে উন্নত করে। উদার ব্যক্তি কখনও এটা পেলাম না, ওটা পেলাম না বলে হা-হুতাশ করেন না। তিনি নিজেকে কখনও বঞ্চিত বোধ করেন না। পাওয়াতে নয়, দেওয়াতেই তাঁর আনন্দ। উদারতা মনকে প্রশান্তিতে ভরিয়ে দেয়।

অন্যদিকে ব্যক্তিস্বার্থের চিন্তা আমাদের মনকে সংকীর্ণ করে তোলে। তখন আমরা সমাজের অন্যান্যদের স্বার্থের কথা, সুখের কথা এবং মঙ্গলের কথা ভুলে যাই। তাতে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। সুতরাং সমাজের ক্ষেত্রেও উদারতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হিন্দুধর্মগ্রন্থসমূহে উদারতার অনেক উপাখ্যান রয়েছে। ঋষি বশিষ্ঠ বারবার বিশ্বামিত্রের প্রতি উদারতা দেখিয়েছেন। দেবতাদের মঙ্গলের জন্য দধীচি মুনির আত্মত্যাগের উদারতা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

আমরাও আমাদের আচরণে উদারতার পরিচয় দেব। অপরের সুখে সুখী হব, অপরের দুঃখে দুঃখী হব। তাহলে আমার ব্যক্তিচরিত্র উন্নত হবে। সমাজেরও মঙ্গল হবে।

একক কাজ : সমাজের দুজন উদার ব্যক্তি চিহ্নিত করে তাঁদের গুণগুলো লেখ।

পাঠ ৩ : পরোপকার

রাতুল আবুলের সহপাঠী। ওরা একই পাড়ায় থাকে। মা, বাবা আর আবুল তিনজনকে নিয়ে ওদের পরিবার। একদিন আবুল স্কুলে এল না। আবুল তো স্কুল কামাই করার মতো ছেলে নয়। রাতুল স্কুল থেকে ফেরার পথে গেল আবুলদের বাড়ি। গিয়ে দেখে আবুলের খুব জ্বর। কিন্তু ওর বাবা বাড়িতে নেই। আবুলের মা আবুলকে ফেলে কোথাও যেতে পারছেন না। তখন রাতুল একদৌড়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনল।

এই যে আবুলদের পরিবারের প্রতি রাতুলের আচরণ, একেই বলে পরোপকার।

'উপকার' মানে ভালো করা। পরের ভালো করার নাম পরোপকার। কোনো স্বার্থের প্রত্যাশা না করে পরের মঙ্গলের জন্য যে কাজ করা হয়, তাকেই বলে পরোপকার।

পরোপকারের পরিচয় পাই কবি কামিনী রায়ের একটি কবিতায়। তিনি লিখেছেন :

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
    এ জীবন মন সকলই দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে
    আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরোপকারের মধ্য দিয়েও জীবের সেবা করা হয়। যেহেতু জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন, তাই পরোপকারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। পরোপকার করলে ব্যক্তি উদার হয়। তার মনে প্রশান্তি আসে। কারণ পরোপকার করার মধ্যে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি আছে। পরোপকারের মধ্য দিয়ে

পাঠ ১ : ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক

সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ ধর্মের দশটি লক্ষণ রয়েছে। এগুলো এক-একটি নৈতিক গুণ। যিনি নৈতিক গুণগুলো অর্জন করেন এবং জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ করেন, তিনি ধার্মিক বলে বিবেচিত হন। লোকে তাকে ভালো মানুষ বলে। তিনিই সমাজের জ্ঞানী মানুষ।

জ্ঞান কেবল অর্জন করলেই হয় না, তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়। সুতরাং ধর্মশিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তাকেও জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ করতে হয়। আর যখন ধর্ম থেকে পাওয়া জ্ঞান নিজেদের জীবন ও সমাজে প্রয়োগ করি, তখন তা হয় নৈতিক আচরণ। ধর্ম কেবল আচারে ও আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম একদিকে 'আত্মমোক্ষায়' অর্থাৎ নিজের চিরমুক্তি ও শান্তির জন্য। অন্যদিক থেকে তা 'জগদ্ধিতায়'– জগতের 'হিত' অর্থাৎ কল্যাণের জন্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন–এ ধর্মীয় শিক্ষা আমি গ্রহণ করলাম এবং এর মধ্যেই থেমে থাকলাম। তাতে কোনো লাভ নেই। যদি আমি জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর আছেন জেনে জীবকে ঈশ্বর জ্ঞানে শ্রদ্ধা করি এবং জীবের সেবা করি, তাহলেই সে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন সার্থক হবে।

এখানে ধর্মশিক্ষা ছিল : জীবকে ঈশ্বর বলে বিবেচনা করবে। আর এ থেকে নৈতিক শিক্ষা পাওয়া গেল : জীবের সেবা করা উচিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্ম হচ্ছে নৈতিক শিক্ষার একটি উপায়। আর নীতি ছাড়া কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

নৈতিক শিক্ষা ধর্মীয় শুভ চেতনাকে জাগ্রত করে আর ধর্ম নৈতিক শিক্ষার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে তোলে। আমরা এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিন্দুধর্মের আলোকে উদারতা, পরোপকার, সৎসাহস ও পরমতসহিষ্ণুতা এ চারটি– নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করব এবং ধর্ম ও নৈতিকতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করব।

একক কাজ : ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার সম্পর্ক চারটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে লেখ।

পাঠ ২ : উদারতা

'উদার' শব্দটির অর্থ হচ্ছে মহান, সজ্জন বা সাধু। উদারতা শব্দটি উদারের ভাব বোঝায়। অর্থাৎ উদারতা হচ্ছে চরিত্রের মহত্ত্ব বা সাধুতা।

যাঁরা সাধু, মহান – তাঁরা সকল মানুষকে সমান মনে করেন। ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ-সবাই তাঁদের কাছে সমান মর্যাদা পায়। সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর কাছে সমান। উদার ব্যক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে – **উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্**। এ কথার অর্থ হলো, উদারচরিত ব্যক্তিদের কাছে পৃথিবীর সকলেই ইষ্টিকুটুম (আত্মীয়)। কেউ পর নয়। উদারতার পরিচয় পাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মানুষ জাতি' কবিতায়, তিনি লিখেছেন :

কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবার সমান রাঙা।

অষ্টম অধ্যায়

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ

ধর্মপালনের মধ্য দিয়ে নৈতিক শিক্ষা অর্জন করা যায়। এ পুস্তকের পঠিত অধ্যায়সমূহ থেকে আমরা জেনেছি, নৈতিকতা গঠনে ধর্ম খুবই সহায়ক। এ ছাড়া ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দয়ার মতো নৈতিক গুণের দৃষ্টান্তমূলক ধর্মীয় উপাখ্যানের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছি। এ অধ্যায়ে আমরা উদারতা, পরোপকার, সেবা, সৎসাহস ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি নৈতিক মূল্যবোধসমূহ এবং এগুলো অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হব। নৈতিকতার পাশাপাশি মাদকাসক্তির মতো একটি অনৈতিক কাজ এবং তা থেকে বিরত থাকার উপায় সম্পর্কে জেনে এ কাজকে আমরা ঘৃণা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- উদারতা, পরোপকার, সেবা, সৎসাহস, পরমতসহিষ্ণুতা এ নৈতিক মূল্যবোধগুলো হিন্দুধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এ নৈতিক মূল্যবোধগুলো অনুশীলনের গুরুত্ব ও গঠনের উপায় বর্ণনা করতে পারব
- মাদক ও মাদকাসক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- মাদক সেবন অনৈতিক কাজ– ব্যাখ্যা করতে পারব
- মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারব
- সামাজিক জীবনে নৈতিক আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ হব।

২. অনিমেষ একজন উদ্যমী ও প্রাণবন্ত যুবক। পাড়ার অন্য ছেলেদের নিয়ে একটি সমিতি গড়ে নানা প্রকার সমাজসেবামূলক কাজ করে। গ্রামের লোকের অর্থসংস্থানের জন্য তারা একটি কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ছোটদের পাঠশালা ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রও গড়ে তোলে। মানুষের বিপদে-আপদেও নানারকম সাহায্য-সহযোগিতা করে। এছাড়া মানুষের মানসিক ও আত্মিক উন্নয়নের জন্য সন্ধ্যার পর কাজের অবসরে ছেলেদের নিয়ে গ্রামে নামসংকীর্তন ও ধর্মসভার আয়োজন করে। এভাবে অনিমেষ ও তার সমিতির নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনিমেষ তৃপ্ত এই ভেবে যে, সৎচিন্তা ও কাজের মাধ্যমে পাড়ার মানুষকে ঐক্যবন্ধ করেতে পেরেছে।

ক. স্বামী বিবেকানন্দের দীক্ষাগুরু কে ?

খ. 'জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা'– ব্যাখ্যা কর।

গ. অনিমেষের কার্যাবলি স্বামী বিবেকানন্দের কোন শিক্ষার সাথে মিল রয়েছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সৎচিন্তা ও কাজের দ্বারা মানুষের মধ্যে একাত্মতা গড়ে তোলা সম্ভব' – কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার প্রতিফলন – মূল্যায়ন কর।

৪. **বনশ্রীর আচরণিক বৈশিষ্ট্যে নিচের কোন মহীয়সী নারীর আদর্শের মিল খুঁজে পাই ?**

ক. মীরাবাঈ খ. সারদাদেবী

গ. শচীদেবী ঘ. শ্যামাসুন্দরী

৫. **সমাজজীবনে উক্ত মহীয়সী নারীর শিক্ষা হলো –**

i. জগৎকে আপনার করতে শেখ, কেউ পর নয়

ii. সাধন ভজন প্রথম জীবনেই করে নেবে।

iii. যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ করলেও শান্তি পায় না।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬. **উক্ত শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের মিল রয়েছে –**

i. হিজেন সমাজের সকলকেই আপন মনে করে।

ii. মালা বাল্যকাল থেকেই নিষ্ঠার সাথে জীবসেবা ও ধর্মকর্ম করে।

iii. সংসারে অশান্তির কারণে কমল সংসার ত্যাগ করল, কিন্তু শান্তি পেল না।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অধ্যাপিকা চিত্রলেখা কৃষ্ণভক্ত, অত্যন্ত মেধাবী ও অমায়িক। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অধ্যাপনা করার পাশাপাশি মানুষের জাগতিক ও আত্মিক উন্নয়নমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর সন্তানের বিয়ে অন্য বর্ণে সম্পন্ন করেছেন। তিনি সবসময় মানুষের ও সমাজের উন্নতির কথা ভাবেন। উদারতা ও ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে হাসিমুখে জয় করেন। তাঁর এই নিরহংকার আদর্শ সকলকে আকৃষ্ট করে। যেকোনো বাধাবিপত্তি আসলেও তিনি তা হাসিমুখে জয় করেন।

ক. মহাপুরুষ কাকে বলে ?

খ. কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার– বাণীটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

গ. শ্রীচৈতন্যের আদর্শের কোন দিকটি অধ্যাপিকা চিত্রলেখার আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নিরহংকার আদর্শ সবাইকে আকৃষ্ট করে- উদ্দীপক ও শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টান্তের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. গোপেরা গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে গেল কেন ?

২. বৎসাসুর কীভাবে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার চেষ্টা করেন ?

৩. কীভাবে কেশব মিশ্রের অহংকারের পতন হয় ?

৪. সমাজের ওপর প্রভু জগবন্ধুর শিক্ষার প্রভাব দৃষ্টান্ত সহকারে বর্ণনা কর।

৫. সারদা দেবীর শিক্ষা আমরা কীভাবে বাস্তবে কাজে লাগাতে পারি ?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. শ্রীকৃষ্ণের কালীয় নাগ দমনের শিক্ষা সমাজজীবনে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় ?

২. স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগোতে উপস্থাপিত বক্তৃতার ফলাফল মূল্যায়ন কর।

৩. 'পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই' — বাণীটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৪. কীভাবে রামপ্রসাদের সাধনা সার্থক হয় ?

৫. হরিজন সম্প্রদায়ের ব্রজজন হয়ে ওঠার কাহিনির শিক্ষা ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিমাইয়ের পিতার নাম কী ?

ক. কেশব মিশ্র খ. জগন্নাথ মিশ্র

গ. নীলাম্বর মিশ্র ঘ. জগৎ মিশ্র

২. কালীয় দমনের দ্বারা উপকৃত হয় —

ক. বলরাম খ. শ্রীকৃষ্ণ

গ. জনগণ ঘ. কালিন্দী

৩. আমাদের আচরণ থেকে যে বিষয়গুলো ত্যাগ করা উচি তা হলো —

i. পরনিন্দা

ii. মিথ্যাচার

iii. কৃতজ্ঞতাবোধ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪, ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বনশ্রী স্বামীর নির্দেশমতো নিষ্ঠার সাথে ধর্মকর্ম ও সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালন করেন। শত কষ্টের মধ্যেও তিনি হাসিমুখে কর্তব্য করে যান। তাই সকলেই তাঁকে ভালোবাসে।

প্রভু জগদ্বন্ধুর কয়েকটি উপদেশ

১. এটা প্রলয়কাল, নাম সংকীর্তনই সত্য। এ যুগে একমাত্র হরিনামই সৃষ্টি রক্ষার উপায়। কেবল হরিনাম কর, হরিনাম কর।

২. ভ্রষ্টবুদ্ধি হয়ে পিতা-মাতার মনে কষ্ট দিতে নেই। যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ করলেও শান্তি পায় না।

৩. বৃথা বাক্যব্যয় দুর্ভাগ্য। পরচর্চা কর্ণে বা অন্তরে স্থান দিও না। পরচর্চা, পরনিন্দা ত্যাগ কর। ঘরের দেয়ালে লিখে রেখ, পরচর্চা নিষেধ।

শিক্ষা : প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, সব মানুষ সমান, কেউ উঁচু-নীচু নয়। কোনো মানুষই ঘৃণ্য বা অস্পৃশ্য নয়। সমাজে সকলেরই সমান অধিকার। পিতা–মাতাকে কষ্ট দিতে নেই। সাধন করতে সংসার ত্যাগ করা লাগে না। পরনিন্দা, পরচর্চা ভালো নয়। এগুলো ত্যাগ করতে হবে। এই শিক্ষাগুলো আমরাও আমাদের জীবনে মেনে চলব।

একক কাজ : প্রভু জগদ্বন্ধুর উপদেশসমূহ কীভাবে নিজের জীবনে প্রয়োগ করবে ?
দলীয় কাজ: তোমাদের জানা কোনো মহাপুরুষ বা মহীয়সী নারী সম্পর্কে দশটি বাক্য লেখ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. শ্রীকৃষ্ণ ....হ্রদে কালীয়কে দমন করেছিলেন।

২. শচীদেবী .... বিল্ববৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করেন।

৩. ক্লাসে নরেন্দ্রনাথের আচরণে প্রকাশ পায় ....।

৪. জমিদার দুর্গাচরণের অনুসরণে আমরা গুণীর .... করব।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সঙ্গে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. শ্রীকৃষ্ণ	নির্ভীকতা
২. নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়	নিজের দোষ দেখা
৩. শাস্তির ভয় না করে সত্য প্রকাশ করাকে বলে	রামপ্রসাদ
৪. মনোমালিন্য রোধ করার ভালো উপায় আগে	যুক্তিখণ্ডনের দ্বারা
৫. 'কবিরঞ্জন' উপাধি পেয়েছিলেন	দিব্যজ্ঞানের অধিকারী
	দুর্গাচরণ

জীব সেবা করবে। কেননা প্রত্যেক জীবের মাঝে ঈশ্বর বিদ্যমান। তাই বৃক্ষ-লতা, পাখ-পাখালি পরিচর্যা করাও সেবার অংশ। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

পারিবারিক জীবনে তথা সামাজিক জীবনে সেবার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য একে অপরকে যথাযথভাবে সেবা করা উচিত। সমাজের প্রত্যেক মহান ব্যক্তিই সেবাপরায়ণ। চিকিৎসক রোগীকে সেবার মাধ্যমে সুস্থ করলে সেখানেই তার সার্থকতা। গরিব-দুঃখী, অনাথকে সেবা করলে মূলত ঈশ্বরকে সেবা করা হয়। মাতৃভূমি আমাদের মা। মায়ের মতো মাতৃভূমিকে আমাদের সেবা করতে হবে।

আমরা পরিবারের সকল সদস্যসহ আত্মীয়-স্বজন, সমাজের সবাইকে সাধ্যমতো সেবা করব। বৃক্ষ-লতাসহ প্রতিটি জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করব। বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত থাকব।

পাঠ ৫ : সৎসাহস

সাহস শব্দটির মানে হচ্ছে ভয় না পেয়ে কোনো কাজ করতে এগিয়ে যাওয়া। নিজের বিপদ হবে জেনেও কল্যাণকর কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার যে প্রবৃত্তি, তার নাম 'সৎসাহস'। জীবনে চলার পথে সৎসাহস দেখানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সৎসাহস মনোবল বাড়ায়। নির্ভীকতার সঙ্গে প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি দাঁড়াতে শেখায়। সবল যখন দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে তখন সৎ-সাহসী দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ান। তার জন্য লড়াই করেন।

অভিমন্যু

মহাভারতে আছে, বালক অভিমন্যু সৎসাহস দেখিয়েছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে সৎসাহস দেখানোর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। দেশকে রক্ষার জন্য সৎসাহস দেখিয়েছিলেন জনা, প্রবীর, বিদুলা প্রমুখ।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা তৎকালীন পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রবল বেশি ছিল না। কিন্তু তাঁদের বুকে ছিল সৎসাহস। তাই সৎসাহস দেশপ্রেমিকেরও একটি বৈশিষ্ট্য। সৎসাহস ধর্মের অঙ্গ এবং একটি নৈতিক গুণ।

একক কাজ : সৎসাহস প্রদর্শনের চারটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তোমার ভূমিকা কী হওয়া উচিত লেখ।

পাঠ ৬ : পরমতসহিষ্ণুতা

আমরা মানুষ। মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, জগৎ-জীবন সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা আছে। নিজস্ব মত আছে।

আমার যেমন নিজস্ব মত আছে, তেমনি অন্যেরও নিজস্ব মত আছে। কিন্তু সাধারণত আমরা আমাদের নিজ নিজ মতকেই বড় করে দেখি। অন্যের মতের গুরুত্ব দিই না। অন্যের মত উপেক্ষা করি। আর এর ফলে আমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধ হানাহানি পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু আমরা যদি অন্যের মতের সারবত্তা বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাহলে কোনো বিরোধ ঘটে না। বরং সকলের মঙ্গল হয়।

এই যে অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করা, অন্যের মতের প্রতি সহনশীল হওয়া, একেই বলে পরমতসহিষ্ণুতা।

পৃথিবীতে অনেক মত, অনেক পথ আছে। ধর্মপালনের ক্ষেত্রেও নানা মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে। সকল মত ও পথকে, সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে পরমতসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়। প্রতিষ্ঠিত হয় সম্প্রীতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব খুব সহজ করে বলেছেন : যত মত, তত পথ। উপাস্যের নাম এবং উপাসনা ও জীবনাচরণের পদ্ধতির মধ্যে বিশিষ্টতা বিভিন্ন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটিয়েছে। আসলে উদ্দেশ্য সকলেরই এক। তা হচ্ছে স্রষ্টার কৃপা লাভ এবং জীব ও জগতের কল্যাণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন–

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥(৪/১১)

অর্থাৎ যে যেভাবে বা যেরূপে আমাকে উপাসনা করে, আমি তাকে সেভাবেই সন্তুষ্ট করি। হে পার্থ (অর্জুন), মানুষেরা সকল প্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে।

পরমতসহিষ্ণুতা সমাজের শৃঙ্খলার অন্যতম উপাদান। পরের মতকে স্বীকৃতি না দিলে এক মতের সাথে অন্য মতের বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। কেবল নিজের ধর্মমতকে শ্রেষ্ঠ মনে করলে, অন্য ধর্মমতের অনুসারীদের খাটো করা হবে।

এ রকম মতান্ধতা জন্ম দেয় ধর্মান্ধতার। আর ধর্মান্ধতা পরিণত হয় গোঁড়ামিতে– হিংস্র সাম্প্রদায়িকতায়। সুতরাং ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণ, ধর্মেরও অঙ্গ।

একক কাজ : সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের পাঁচটি ক্ষেত্র চিহ্নিত কর।

পাঠ ৭ : উদারতা, পরোপকার, সেবা, সৎসাহস ও পরমতসহিষ্ণুতা– এ নৈতিক গুণগুলো অনুশীলনের গুরুত্ব ও উপায়

উদারতা মানুষকে মহান করে। পরোপকার করলে সমাজের মঙ্গল হয়। উদার ব্যক্তির একটি গুণও আবার পরোপকার করার মনোভাব। অন্যদিকে পরোপকার করা উদার ব্যক্তির একটি বৈশিষ্ট্য। একটির সঙ্গে আরেকটি জড়িত।

উদারতা ও পরোপকারের মধ্য দিয়ে ধর্ম পালিত হয় এবং নৈতিকতা অর্জন করা যায়। জীবকে সেবা করলে স্বয়ং ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়।

সৎসাহস হচ্ছে ভালো কাজে সাহস দেখানো। দুষ্টের দমন, ন্যায়বিচার, দেশরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সৎসাহসের প্রয়োজন।

পরমতসহিষ্ণুতা সম্প্রীতি ও শান্তি স্থাপনের অন্যতম উপায়। পরমতসহিষ্ণুতা সমাজকে সুশৃঙ্খল রাখে। যখনই পরমতসহিষ্ণুতার অভাব ঘটে, তখনই উদ্ভব ঘটে সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার। সুতরাং শান্তি, সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

দলীয় কাজ : 'উদারতা, পরোপকার, সৎসাহস ও পরমতসহিষ্ণুতাই ব্যক্তিচরিত্রকে উন্নত করে'– উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

পাঠ ৮ : মাদক সেবন অনৈতিক কাজ

এবার একটি অনৈতিক কাজের কথা বলব, যা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। তা হলো মাদক সেবন। **মাদক** হচ্ছে এমন কিছু জিনিস, যা নেশার সৃষ্টি করে। যেমন – বিড়ি, সিগারেট, তামাক, মদ, গাঁজা, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল ইত্যাদি। এছাড়া ঘুমের ওষুধ নামক চেতনাশিথিলকারী কিছু ওষুধও মাদক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মাদকাসক্তি

মাদকাসক্তি বলতে বোঝায় মাদক দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীলতা এবং মাদক গ্রহণের ঐকান্তিক আগ্রহ।

মাদক সেবন ও অনৈতিক কাজ

মাদক সেবন একটি অনৈতিক কাজ। মাদকসেবন ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি করে এবং পরিবার ও সমাজের অমঙ্গল ডেকে আনে।

দৈহিক ক্ষতি

মাদকসেবন করলে নানা রকমের রোগ হয়। যেমন – খাবারে অরুচি, বদহজম বা হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া, অপুষ্টি, শ্বাসনালির ক্ষতি, স্থায়ী কফ ও কাশি, হাঁপানি, ফুসফুসের ক্যান্সার প্রভৃতি।

এ ছাড়া হৃদ্‌রোগও হতে পারে। কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মানসিক ক্ষতি

মাদক সেবনে নেশা হয়। মাদকাসক্ত অবস্থায় বিবেকবুদ্ধি লোপ পায়। তখন মাদকসেবী না-করতে পারে, এমন কোনো কাজ নেই।

আর্থিক ক্ষতি

মাদকদ্রব্য ক্রয়ের জন্য মাদকসেবীকে প্রতিদিন প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ অর্থ যোগাড় করতে মাদকসেবী মা-বাবা আত্মীয়স্বজনের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। কখনও কখনও অসদুপায় অবলম্বন করে মাদকের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। সুতরাং মাদক সেবন এমন একটি অনৈতিক কাজ, যা আরও অনেক অনৈতিক কাজে লিপ্ত করে।

মাদক সেবনে পরিবার ও সমাজের অমঙ্গল হয়। পরিবারে শান্তি থাকে না। মাদকসেবী কখন কী করে বসে তার জন্য পরিবারের সকল সদস্য উদ্বিগ্ন থাকে। সমাজেও এর প্রভাব পড়ে।

হিন্দুধর্ম অনুসারে মাদক সেবন বা নেশা করা মহাপাপ। মাদকসেবী মহাপাপী। কেবল তা–ই নয়। মাদকসেবীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বা চলাও মহাপাপ। সুতরাং মাদকাসক্তি থেকে আমরা বিরত থাকবই।

মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকার উপায় হচ্ছে :

১. মাদকসেবন মহাপাপ– ধর্মীয় এ অনুশাসন মেনে চলা।

২. মাদক সেবন অনৈতিক কাজ– সুতরাং নৈতিক দিক থেকেও আমরা মাদক গ্রহণ করব না।

৩. মাদকসেবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না-করা বা সম্পর্ক না-রাখা।

৪. প্রতিজ্ঞা করা :

মাদককে না বলব,
নীতিধর্ম মেনে চলব।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে .... করতে হয়।

২. উদারতা মানবচরিত্রকে .... করে।

৩. সৎসাহস .... বাড়ায়।

৪. পরমতসহিষ্ণুতা সমাজে .... প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান।

৫. 'মাদক সেবন মহাপাপ' –এ ধর্মীয় অনুশাসন .... চলব।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ধর্ম কেবল আনুষ্ঠানিকতায়	আত্মতৃপ্তি আছে
২. উদার চরিত্রের ব্যক্তিদের কাছে	নানারকমের রোগ হয়
৩. পরোপকার করার মধ্যে এক ধরনের	অন্যতম উৎস
৪. মাদক সেবন করলে	পৃথিবীর সকলেই ইষ্টকুটুম
	সীমাবদ্ধ নয়

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. 'নৈতিক শিক্ষা ধর্মীয় শুভ চেতনাকে জাগ্রত করে'– উক্তিটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

২. উদারতার ধারণাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৩. কীভাবে পরোপকার করা যায় ? দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাখ্যা কর।

৪. ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সৎসাহসের গুরুত্ব দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর।।

৫. মাদক সেবনে দেহের কী ক্ষতি হতে পারে ?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

২. সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে উদারতা অনুশীলনের প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

৩. সমাজজীবনে পরোপকারের উপায় চিহ্নিত করে প্রয়োগ দেখাও।

৪. মাদক সেবনের আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **আত্মত্যাগের নৈতিক চেতনাকে কী বলে ?**

ক. পরোপকার খ. উদারতা

গ. সত্যবাদিতা ঘ. কর্তব্যনিষ্ঠা

২. **সৎসাহস বলতে বোঝায় –**

i. কোনো কাজে ভয় না-পাওয়া

ii. জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপদ মোকাবেলা করা

iii. দুর্বলের পক্ষে ন্যায়ের জন্য লড়াই করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. **'যত মত, তত পথ'– এটি কার বাণী ?**

ক. শ্রী রামচন্দ্র খ. শ্রী রামকৃষ্ণ

গ. শ্রী বিজয় কৃষ্ণ ঘ. শ্রী রামপ্রসাদ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সাধন মুখার্জী গত দুর্গোৎসবে বিজয়াদশমীর দিন মধ্যাহ্নভোজে গ্রামের সকল স্তরের মানুষকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাদের সাথে বসে তিনিও আহার করেন। এতে প্রতিবেশি সুখেন চক্রবর্তী মুগ্ধ হয়ে তার আচরণ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হন।

৪. **সাধন মুখার্জীর আচরণে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে ?**

ক. ক্ষমা খ. সৎসাহস

গ. উদারতা ঘ. পরোপকার

৫. **উক্ত গুণটির অনুশীলনে সুখেনের করণীয় –**

ক. ভুলের জন্যে কাউকে শাস্তি না- দেওয়া

খ. জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপদ মোকাবেলা

গ. সকল মানুষকে সমান মর্যাদা প্রদান

ঘ. পরের মঙ্গলে স্বার্থ ত্যাগ।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদ, ছেলে-মেয়ে নিয়ে পূরবী দত্তের সুখের সংসার। তার স্বামী প্রবাসে চাকুরি করেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সংসারের সকল দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পরিবারের বিভিন্ন কাজ যেমন– সন্তানের শিক্ষা, সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নেন। এতে পরিবারের সবাই তাকে পছন্দ ও শ্রদ্ধা করে।

ক. ধর্মের কয়টি লক্ষণ রয়েছে ?

খ. 'ধর্ম হচ্ছে নৈতিক শিক্ষার একটি উপায়'– ব্যাখ্যা কর।

গ. পূরবী দত্তের চরিত্রে যে নৈতিক গুণটি ফুটে উঠেছে– তা নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পরিবার ও সমাজে শৃঙ্খলা আনয়নে উক্ত গুণটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম-হিন্দুধর্ম শিক্ষা

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ।

– শ্রী রামকৃষ্ণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।